জীবন জাগার গল্প-৬

আমি যদি পাখি হতাম

মুহাম্মাদ আতীকুল্লাহ

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ।
শিক্ষক পিতা ও গৃহিনী মায়ের চতুর্থ সন্তান। খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়িতে জন্ম। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পাহাড়ঘেরা পার্বত্য জনপদে। বনবাদাড়ের ভয়জাগানো আদিম আবহাওয়ায়। স্রোতস্বিনী পাহাড়ী নদীর উত্তাল স্রোতের সাঁতার খেলে। বহু উপজাতির নানাবিধ বৈচিত্র্যময় সমাজে। পিত্রালয় ও মাতুলালয় ফেনীর ভাবগম্ভীর ধর্মীয় আবহে।
পড়াশোনার সূত্রে সময় কেটেছে গ্রামবাঙলার নিতান্ত পল্লীর গ্রামীণ পরিবেশে। প্রাচীন ধারার কওমী মাদরাসার আমলি পরিবেশে।
পড়াশোনার হাতেখড়ি বাবা ও মায়ের কাছে। মাদরাসাজীবন কেটেছে, মামা মাওলানা সাইফুদ্দীন কাসেমী (দা. বা.)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। তিনি হাকীমুল উম্মতের এর অন্যতম প্রধান খলীফা মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী রহ.-এর খাস সোহবতপ্রাপ্ত। ফেনীর ঐতিহ্যবাহী জামিয়া মাদানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম।
ফলে মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ বেড়ে উঠেছেন খানকাহী মেজাজে, সুনিপুণ তরবিয়তের মধ্যদিয়ে। ছোটবেলা থেকেই তার মাঝে দাওয়াত, তালীম, জিহাদ ও খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াতের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে।
পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক শাসন ও শান্তিবাহিনীর দৌরাত্ম্যে সৃষ্টি হওয়া টানটান উত্তেজনাময় আশির দশক তার মনমননে গভীর রেখাপাত করেছে। পাশাপাশি এই দশকের অবিস্মরণীয় ঘটনা, আফগান জিহাদ তাকে দিয়েছে ভিন্নধর্মী এক চেতনা। বিশ্ব রাজনীতি ও মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে তার আছে গভীর পাঠ।
চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া থেকে তিনি তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস) সমাপ্ত করেছেন। কুরআনের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম প্রতিষ্ঠা করে। যার অন্যতম লক্ষ্য কুরআনের আলোয় আলোকিত সমাজ বিনির্মাণ। মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ স্বভাবগতভাবে নিভৃতচারী হলেও কাছের মানুষরা জানে তিনি বেশ রসিক মানুষ। বই পড়া তার পেশা ও নেশা। অনলাইনে পঞ্চাশেরও অধিক শিরোনামে ধারাবাহিক লেখা লিখে চলছেন বিরামহীনভাবে।
তার লিখিত জীবনজাগার গল্প সিরিজের লেখাগুলো বেশ সুখপাঠ্য। পাঠক অবচেতনমনেই আকৃষ্ট হয় কুরআনের প্রতি। ইতিহাস বিষয়ক তাঁর লেখাগুলো আমাদের জাগিয়ে তোলে গাফলাতের সুখনিদ্রা থেকে। উদ্বুদ্ধ করে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে। আল্লাহ তাঁর কলমকে আরও শাণিত করুন। গোটা বিশ্বকে কুরআনি আলোয় আলোকিত করুন।

প্রকাশক

মাযহার

আমি যদি পাখি হতাম

[প্রেরণার গল্প]

মুহাম্মাদ আতীকুল্লাহ

শিক্ষক

তারজামাতু মা'আনিল কুরআন, সীরাত, ইতিহাস

মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

শ্যামলী, ঢাকা

মাকতাবাতুল আযহার

উৎসর্গ

শায়খ মাহমুদুল হাসান (লন্ডনী) দামাত বারাকাতুহুম

ওস্তাদ বিভিন্ন ধরনের হতে পারেন, কেউ হন স্রেফ দরসগাহের ওস্তাদ। আবার কেউ দরসগাহ ছাড়িয়ে জীবনের গণ্ডিতে ঢুকে পড়েন!

শুরুর কথা

গল্প আর আড্ডা দু'টো কি এক? বোধ হয় এক নয়। অর্থগত পার্থক্যের পাশাপাশি ব্যবহারগত পার্থক্যও আছে। গল্প করা মানে কি আড্ডা দেয়া? অথবা আড্ডা দেয়া মানে কি গল্প করা? প্রশ্নটা আপাতত শিকেয় তুলে রাখি!

❖

গল্প বলতে আমরা কী বুঝি? এক দেশে এক রাজা ছিল-টাইপ কিছু? গ্রাম থেকে গরীব ছেলে শহরে বড়লোক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে বা পড়তে এসেছে এবং............টাইপ কিছু? বিদেশে ভ্রমণ করতে গিয়ে বা দূরপাল্লার যাত্রায় 'ভিন্ন' কেউ সহযাত্রী হয়ে গেছে-টাইপ কিছু? পথচলতি পথিকের লটারি কিনে, কোটিপতি হয়ে যাওয়া টাইপ কিছু? সর্বস্ব হারিয়ে আবার ফিরে পাওয়া টাইপ কিছু?

❖

যে যাই ভাবুক, গল্প গল্পই। সত্য হোক, মিথ্যে হোক। বানানো হোক, সত্যনির্ভর হোক, গল্পের একটা আলাদা 'রূপরস' আছে। আলাদা একটা আমেজ আছে। স্বতন্ত্র একটা রঙঢঙ আছে। ভিন্ন এক মৌতাত আছে। অন্য এক ভিয়েন আছে।

❖

সবাই গল্প বলতে পারে না। আমরা প্রায় সবাই গল্প বলতে পছন্দ করি। গল্প শুনতে পছন্দ করি। একদম গোমড়ামুখো মানুষও গল্পের সন্ধান পেলে, উৎকর্ণ হয়ে গল্প শোনেন। কথা কম বললেও, উপযুক্ত পরিবেশ পেলে, স্বল্পবাকও সবাক সরব হয়ে ওঠেন। গল্পে মেতে ওঠেন। কারো গল্প দুয়েক বাক্যেই ফুরিয়ে যায়। আবার আরেকজন সেই একই গল্পকেই ইনিয়ে-বিনিয়ে তিন মাইল লম্বা করে বলতে পারেন। একই গল্প শুনে, কেউ হাসে, কেউবা কাঁদেও! পার্থক্য কোথায়? বলার ভঙ্গিতে! উচ্চারণের 'স্টাইলে'।

❖

অনেক সময় দেখা যায়, লব্ধপ্রতিষ্ঠিত গল্পকারও একটা গল্পকে যুৎসইভাবে উপস্থাপন করতে পারেন না। পারবেন কী করে? তিনি লিখেছেন অর্থের

তাগিদে! রুজিরুটি ধান্ধায়! গল্পের সাথে যদি প্রাণের যোগ না থাকে, গল্প আর গল্প থাকে না, সেটা হয়ে পড়ে, সপাং সপাং বেতের ভয়ে মাস্টার মশাইয়ের কাছে গড়গড়ে পড়া শোনানোর মতো! সেখানে হাসি-কান্নার অবকাশ নেই! গরজ আর দায়মুক্তিই সেখানে শেষকথা!

❖

গল্প কোথায় পাওয়া যায়? গল্পের কোনও স্থান কাল পাত্র নেই। কান পাতলেই গল্প পাওয়া যায়। রিকশাওলার কাছে গল্প পাওয়া যায়। ঠেলাগাড়ির চালকের কাছে গল্প পাওয়া যায়। মায়ের কাছে গল্প পাওয়া যায়। বাসের সহযাত্রীর কাছে গল্প পাওয়া যায়। চলন্ত বাস বা রেলের জানালা দিয়ে সাঁৎ করে চলে যাওয়া অপসৃয়মাণ দৃশ্যে গল্প পাওয়া যায়। জেলের জাটকা জালে গল্প পাওয়া যায়। কুমারের চাকতির মধ্যে গল্প পাওয়া যায়। মুজাহিদের ক্লাশিনকোভে গল্প পাওয়া যায়। জালিমের গ্লিসারিন মাখা কান্নায় গল্প পাওয়া যায়। শুধু কুড়িয়ে নেয়ার বাকি!

❖

গল্পের কি কোনও রঙ আছে? লাল গল্প, নীল গল্প, সবুজ গল্প, হলুদ গল্প, শাদা গল্প, কালো গল্প? রঙ আছে কি নেই সেটা নির্ভর করবে শ্রোতার কল্পনার ওপর! শ্রোতা বা পাঠক যেভাবে গল্পটাকে গ্রহণ করবে, যে রঙ দিয়ে গ্রহণ করবে, সেটাই হবে গল্পের রঙ। একজন গল্পকারকে যেমন সুন্দর করে কল্পনা করতে জানতে হয়, একজন গল্পশ্রোতা বা গল্পপাঠককেও কল্পনার জগতে ডুব দিতে জানতে হয়। নইলে গল্পের আসরটা ঠিক জমে না।

❖

গল্প তো গল্পই! সত্যগল্প বা মিথ্যগল্প বলে কিছু নেই! হাঁ, গল্পের বিষয়টাতে সত্য বা মিথ্যার মিশেল থাকতে পারে! খাদ থাকতে পারে! গাদ থাকতে পারে! কিন্তু বানানো গল্প থেকেও হীরে-জহরতের ফসল তুলে আনা যায়। সেজন্য প্রয়োজন জহুরীর দৃষ্টিঅলা পাঠক! আপনি তো তাই!

সূচিপত্র

আমি যদি পাখি হতাম

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

জীবন জাগার গল্প : ৩৮২

কুরআন-কুমারী!

এক.

হেফযখানায় পড়া চলছে, তালিবে ইলমরা দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করছে। শিক্ষিকা ঘুরে ঘুরে পড়া শুনছেন। ভুল হলে শুদ্ধ করে দিচ্ছেন। হাতে ছোট্ট একটা ছড়ি। সেটা কেউ কোনও দিন ব্যবহৃত হতে দেখেনি। হাতির দাঁতের মতো! দেখানোর জন্যে। মারার জন্যে নয়। ধরা পড়লো একজন আসেনি।

–এই রাবেয়া! জামাল কোথায় রে!

–আসেনি!

–কেন আসল না?

–আর পড়বে না। কায়রোতে বাবার কাছে গিয়ে চাকরি করবে!

–চল তো দেখে আসি! এই খোকারা! তোরা সবাই ভাল করে পড়। কেমন?

–জামাল বাড়ি আছিস?

–জি হাজ্জাহ!

–বেরিয়ে আয় বলছি! কিরে, তুই নাকি আর হেফয পড়বি না!

–জি!

–তাহলে আমি এতদিন তোর জন্যে শুধু শুধু মেহনত করলাম? সময় ব্যয় করলাম? আমার সময় ফেরত দে!

–ইয়ে.. মানে সময় কিভাবে ফেরত দেবো?

–তাহলে টাকা দে!

–আমি কায়রো গিয়ে চাকরি করে পাঠিয়ে দেবো!

–না! বাকিতে ফাঁকি! এখনই দে!

–আমি টাকা কোথায় পাবো?

–তাহলে পড়তে চল! তোর আম্মু কোথায় ডাক!

কী ব্যাপার! আপনি ছেলের পড়াশোনা বন্ধ করে দিচ্ছেন কেন?

–আমি কোথায় বন্ধ করলাম? তার মনে কী দুষ্টুবুদ্ধি চেপেছে সেই জানে! বাড়িতে খাবার নেই। ভুখ-ক্ষুধার কষ্ট দেখে ছেলে আর পড়তে চাচ্ছে না।

–ঠিক আছে, এবার থেকে তার খাওয়ার দায়িত্ব আমার! মাদরাসায় থেকেই পড়াশুনা করবে! হেফয শেষ করার আগে বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করবে না!

দুই.

এতক্ষণ বলছিলাম নাফীসা আলী (রহ.)-এর কথা। জন্ম ১৯১৬ সালের শেষ দিকে। মিশরের এক গাঁয়ে। কুফরুশ শানহাব। বাবা-মায়ের আনন্দ আর ধরে না। এমন ফুটফুটে কন্যাসন্তান! পরহজেগার পিতা তখন থেকেই নিয়ত করে ফেলেন আল্লাহর দেয়া এই উপহারকে পরম আদর যত্নে গড়ে তুলতে হবে। কুরআনের খাদেমা বানাবেন মেয়েকে। হাফেয হবে তার মেয়ে। হবে কুরআনের সেবিকা।

তিন.

একটু বড় হয়ে হাঁটাচলা শুরু করেছে, মুখে একটু আধটু বোল ফুটেছে। মেয়েটা এখন ছোটাছুটি করে উঠোনময় মোরগ তাড়াতে পারে। বাবার পিছু পিছু মসজিদে যেতে পারে। মায়ের আঁচল ধরে কুয়োতলায় যেতে পারে। হরফ চেনা শুরু হয়েছে। চক-খড়ি দিয়ে টুকটাক হিজিবিজি লেখার চেষ্টাও করে।

পূর্ব কোন আভাস ছাড়াই মেয়েটা মারাত্মক রোগে পড়লো। দিনদিন শুকিয়ে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। বাবা-মায়ের চোখে ঘুম নেই। আল্লাহর প্রতিও কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু কচি মা-মণিটার এহেন কষ্টও সহ্য করা যাচ্ছিল না। মিশরের এমন অজপাড়া গাঁয় ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থাও নেই। তার ওপর আর্থিক অসঙ্গতির কারণে ভাল কিছুও করা যাচ্ছে না। অবিরাম দু'আ-রোনাজারি আর অক্লান্ত সেবা শুশ্রুষায় আল্লাহ মেয়েটাকে সুস্থ করে দিলেন।

মেয়েটা এখনো বিছানায় পড়ে আছে। তবে খাওয়া-দাওয়ার রুচি ফিরেছে। একটা বিষয় বড়ই ভাবিয়ে তুলছে বাবা-মাকে; মেয়েটা চোখ খুলতে পারছে না। পিটপিট করে তাকালেও পরক্ষণেই আবার বন্ধ করে ফেলছে। আলো সহ্য করতে পারছে না। একদিন মেয়ের কথা শুনে সবাই বজ্রাহত হয়ে পড়লো,

–আম্মু! তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন?

কষ্ট হলেও আল্লাহর ফয়সালা মেনে নিতেই হয়। তিনি যা করেন বান্দার ভালোর জন্যেই করেন। এটুকু বুঝ ঘরের মানুষদের ছিল। বাবার কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লেও, লক্ষ্য থেকে একচুলও পিছু হটেননি। নিত্যদিন মেয়েকে কোলে-পিঠে করে মাদরাসায় বয়ে নিয়ে যান। আবার ফিরিয়ে আনেন। বাবার সারাদিনের কাজই ছিল মেয়েকে নিয়ে থাকা। তার কু আন পড়ার কাজে সার্বিক সহযোগিতা করা। আল্লাহর পাক কালাম মুখস্থ করতে উৎসাহ যুগিয়ে যাওয়া।

আল্লাহ চোখ তুলে নিলেও অন্য দিক দিয়ে একেবারে উপচে দিলেন। মেয়েটা অল্প ক'দিনের মেহনতেই পুরো কুরআন কারীম কণ্ঠস্থ করে ফেললো। তার সুললিত পড়া শুনে সবাই বিমুগ্ধ। গ্রামের মাদরাসায় পড়ার পাট চুকলো। এবার?

অদূরে একটা জায়গা আছে। সেখানে কুরআনের বড় বড় আলেম-হাফেয-কারীরা থাকেন। বাবা মেয়েকে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। কুরআন কারীমের ওপর আরও উন্নত শিক্ষার সুযোগ এসে গেল। মেয়ের খুশির অন্ত নেই। এর মধ্যে একজন মহিলা উস্তায পেয়ে গেলেন বাবা। শায়খাহ নুর বদবী। উস্তাযও মনের মতো ছাত্রী পেয়ে মনপ্রাণ ঢেলে নিজের অর্জিত ইলম শেখানোয় ব্রতী হলেন।

চার.

পড়াশুনার পর্ব শেষ হলো। এবার কর্মজীবন। গ্রামের মেয়ে গ্রামে ফিরে এল। ছেলেবেলার মাদরাসায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত হলো। গতানুগতিক নয়, ছেলেমেয়েরা যাতে মনের আনন্দে পড়তে পারে, এমন পরিবেশ গড়ে তুললেন। আশেপাশে একটা বাচ্চা ছেলেও যেন কুরআন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেদিকে সদা তৎপর থাকলেন। চোখ নেই তো কী হয়েছে, মনের চোখও কি নেই? যার কাছে কুরআন আছে, তার আর কোনও চোখের দরকার হয়?

যেসব ছেলে-মেয়ে সরকারী স্কুল বা কাজের কারণে দিনের বেলা কুরআন পড়তে পারে না, তাদের জন্যে ফজর আর মাগরিবের পর বিশেষ পাঠের ব্যবস্থা নিলেন। কোনও রকম বিনিময় ছাড়াই। নিজের বেতনের টাকা দিয়ে গরীব ছাত্রদের খরচাপাতি চালালেন।

এভাবে একসময় বিয়ের বয়েস এসে গেলো। মেয়ের এদিকে কোনও উদ্যোগ-আগ্রহ না দেখে, বাবা-মা চিন্তিত। আগে বলেকয়েও রাজি করাতে পারেননি। ভাল ভাল প্রস্তাব আসছে। মেয়ে অন্ধ শুনেও অনেকে আগ্রহী হচ্ছে। মেয়ের এক কথা, আরও কিছুদিন পর।

ঘরে কানাঘুষা শুরু হলো। বাইরেও। এবারের প্রস্তাবটা ফেলনা নয়। পাত্র সবদিক দিয়েই যোগ্য। মেয়েকে মাথায় তুলে রাখবে। তার কাজেও বাধা-বিঘ্ন ঘটাবে না। বাবা এক রাতে মেয়ের কাছে প্রস্তাবটা পাড়লেন,

–নাফীসা! মা! আমরা আর কতদিন! পরপারের ডাক তো এসে গেলো! তোর বিয়েটা দিয়ে যেতে পারলে, মনটা হালকা হত!

–ওটা নিয়ে তোমরা এত ব্যস্ত কেন? আমাকে আমার মতো থাকতে দাও না!

–তা কি হয় রে মা! তুই এত গুণী একটা মেয়ে, কতো ভাল ভাল ছেলে তোর পাণিপ্রার্থী! এবার আর না করিস না!

–আব্বু! তাহলে শোন! আমি এতদিন পাশ কাটিয়ে পার পেয়ে গেলেও আর পারবো না বুঝতে পারছি! আমি অনেক দিন আগেই মনে মনে একটা সংকল্প করেছিলাম!

–কী সংকল্প রে মা!

–আমি কখনো বিয়ে করবো না!

–এ কেমন কথা শোনালি রে মা!

–জি আব্বু! আমি আমার জীবনকে কুরআন কারীমের জন্যে হেবা (দান) করে দিয়েছি। আমার ইহজীবন কুরআনের তরেই ওয়াকফ করেছি। এটাই আমার চূড়ান্ত কথা! আর জোরাজুরি না করলে খুশি হবো। কিভাবে আমি আরও বেশি করে কুরআন কারীমের খেদমত করতে পারি, সেদিকটা দেখ!

বাবার মনটা ভীষণ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। মা তো কথাটা শুনে হায় হায় করে উঠলেন। আমার নাফীসার কী হবে গো! তার মাথায় এমন পাগলামী কে ঢুকালো রে! স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে আলী বসিয়ুনী বললেন,

–হাসানা! ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো, কতো মহান এবং বড় একটা মেয়ের মা হতে পেরেছো! একটা মেয়ে শুধু কুরআনের খেদমতের জন্যেই নিজেকে আজীবন কুমারী রেখে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে, ভাবতে পারো? এ যে মরিয়ম (আ.)-এর মতোই হয়ে গেলো! নাফীসার জন্যে দু'আ করো! তার দৃঢ়তার জন্যে দু'আ করো।

পাঁচ.

যতই দিন গড়াচ্ছে, মুহতারামা নাফীসার কুরআন নিয়ে মেহনতের মাত্রা ও পরিমাণও বেড়েই চলছে। এক পর্যায়ে এমন দাঁড়ালো, গ্রামের ছেলেবুড়ো সবাই তার ছাত্র। আশেপাশের সমস্ত মায়েরা তার ছাত্রী। সবার আস্থার জায়গা। বড় বড় ব্যক্তিরাও তার কাছে দু'আর জন্যে আসেন। মিশর সরকারও তাকে নানা পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন।

ছয়.

বাবা-মা দু'জনেই পরপারে পাড়ি জমালেন। ভীষণ একা হয়ে গেলেন। কিন্তু কুরআনকে যিনি সাথী হিশেবে বেছে নিয়েছেন তিনি কি কখনো নিঃসঙ্গ হতে পারেন? এরই মধ্যে এক অবাক কাণ্ড ঘটলো। স্বপ্নে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন। একবার নয় কয়েকবার। মন ছুটে গেল মদীনার পানে। কিছুতেই দমিয়ে রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু সফরের রাহাখরচা? একা তো যাওয়া যাবে না। ভাইদের কাউকে সাথে নিয়ে যেতে হবে! উপায়? মীরাসসূত্রে কিছু পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। সেটাই অবলীলায় বিক্রি করে দিলেন। হাঁফ ছাড়লেন হজ্জের খরচের ব্যবস্থা হয়েছে। আল্লাহ তার এই নেক বান্দীর মনের আশা পূরণ করলেন।

সাত.

এক অদ্ভূত স্বপ্ন দেখলেন। অসম্ভব সুন্দর এক বাগান। নানারকম ফুলফলে শোভিত। বলা হলো এটা তোমার নিজস্ব জায়গা। পেটে ক্ষুধা থাকায় একটা আপেলের দিকে হাত বাড়ালেন।

—গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এলো, এখনো এটা খাওয়ার সময় আসেনি।

হজ্জের সফর থেকে ফিরে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। শরীর ভেঙে পড়লো। দিনদিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছিলেন। বিছানায় শুয়ে শুয়েও সারাক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করছেন তো করছেনই। সামান্য সময়ও বিরাম-বিশ্রাম নেই। প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। কিন্তু ঠোঁট তখনো নড়ছে। কুরআন নিয়ে জীবন পার করেছেন, কুরআন নিয়ে আল্লাহর কাছে চলে গেলেন। ২০০১ সালে।

জীবন জাগার গল্প : ৩৮৩

সাবানের কারখানা

বিরাট এক সাবান-কারখানা। হালাল (!) সাবান। এই কোম্পানির সাবানের দেশজোড়া নামডাক। ইদানীং বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। কর্মাচারীরাও মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে। কারখানার মালিক তাদের দিকে ভালোই নজর রাখে। সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ায়।

গত কয়েক মাস যাবত একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সাবান-কারখানা অনেক পুরনো হওয়াতে, মেশিন-যন্ত্রও পুরনো হয়ে গেছে। দেশের বিভিন্ন জায়গার পাইকারদের কাছ থেকে অভিযোগ এসেছে, মাঝেমধ্যে কিছু প্যাকেটের মধ্যে সাবান থাকে না। চালানের সময় খালি প্যাকেটই যায়। ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কেউ কেউ এই সাবান কেনাও বন্ধ করে দিয়েছে।

অনুসন্ধান করে জানা গেল, সাবানগুলো যে মেশিনে গিয়ে প্যাক হয়, সেটাতে সমস্যা। পুরনো হয়ে যাওয়াতে আগের মতো দ্রুত প্যাক করে সেরে উঠতে পারে না। মাঝেমধ্যে দু'একটা প্যাকেট ফস্কে যায়।

কোম্পানির বোর্ড মিটিং ডাকা হলো। অন্য কোম্পানি থেকেও অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানদের আমন্ত্রণ জানানো হলো। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো,

= কোম্পানি একটা লেজার গাইডেড মেশিন কিনবে। এই মেশিন খালি প্যাকেট থাকলে ধরে ফেলবে। দাম পড়বে পাঁচ লাখ টাকা।

কোম্পানির মালিক এত টাকার কথা শুনে বেঁকে বসলো। সামান্য একটা সমস্যা নির্ণয় করার জন্যে এতগুলো টাকা ব্যয় করতে হবে? তারপরও কোম্পানির সুনামের কথা শুনে মেনে নিল। মেশিনটা কিনতে সম্মত হলো।

বিকেল বেলায় অফিস টাইম শেষে, একজন সাধারণ কর্মচারী মালিকের চেম্বারে এল। সে বললো,

–স্যার, কিছু মনে না করলে একটা কথা বলতে চাই।

–কি কথা?

–কোম্পানি যে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে মেশিন কিনতে যাচ্ছে, সেটা না কিনলেও আপাতত চলবে।

–কিভাবে?

-মাত্র পাঁচ হাজার টাকা দিয়েই সমস্যাটার সমাধান সম্ভব।

–বলো কি?

–জি। স্যার।

–ঠিক আছে এই নাও, দেখি তুমি কি করতে পারো।

পরদিন দেখা গেল, চলমান বেল্টের যেখানে সাবানগুলো এসে বাক্সভর্তি হয়, তার কিছু আগে একটা 'জি এফ সি' ফ্যান সজোরে চলছে। আর তীব্র বাতাসের তোড়ে খালি প্যাকেটগুলো উড়ে চলে যাচ্ছে। সাবানভর্তি প্যাকেটগুলোই শুধু বাক্সে গিয়ে পড়ছে।

জীবন জাগার গল্প : ৩৮৪

ইন্দেনেশিয়ার 'খানসা'

পিতা শহীদ হয়েছেন। স্বামীও শাহাদাত বরণ করেছেন। সবাই বলে কয়ে দ্বিতীয় বার বিয়ে দিল। এই স্বামীও শহীদ। তারপরও ভেঙে পড়লেন না 'তাজওয়াত নাজাক দীন'। মনোবল হারালেন না।

বীরদর্পে মুজাহিদ বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে গেলেন পর্দার আড়ালে থেকে। দীর্ঘকাল ধরে ডাচ সৈন্যদেরকে নাকানি চুবানি খাইয়ে যেতে লাগলেন। ইন্দোনেশিয়াকে হানাদারমুক্ত করা পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলবে। তার এই অদম্য সাহসিকতা দেখে সবাই তাকে 'জিহাদের রানি' উপাধি দিল।

হল্যান্ডের চৌকশ বাহিনী অনেক চেষ্টা করেও তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলো না। নিত্য নতুন পন্থায় মুজাহিদ বাহিনীকে সংগঠিত করে গেলেন। ডাচ ঔপনিবেশিক শক্তিকে সমূলে উৎখাত করার আগে বিশ্রাম নেবেন না, এ ছিলো এই মুমিন বান্দীর প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু বয়েস তো আর থেমে থাকে না। বার্ধক্যজনিত কারণে দৃষ্টিশক্তি হারালেন। আগের মতো তড়িৎ নড়াচড়া করতে পারেন না। এই বয়সেও তিনি ডাচ বাহিনীর জন্য সাক্ষাৎ যম। তারা তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ডাচ বাহিনী একদিনে মুজাহিদদের অবস্থান জেনে, গোপনে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। জিহাদের রানিকে গ্রেফতার করে। আল্লাহর এই সাহসী

বাঁদী দমে গেলেন না। যে সৈন্য তাকে হাতকড়া পরাতে এল, তার বুকে খঞ্জর বসিয়ে হত্যা করলেন।

ডাচ সরকার তাকে এক দূরদীপে নির্বাসিত করলো। সেখানকার অধিবাসীরা ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। সরকারের ভয়, এই মহিলা যেখানে যাবে, সেখানেই সবার মধ্যে কিভাবে যেন জিহাদের আগুন জ্বালিতে দেয়। এখানে সেটা হবে না। ভাষা তো জানা নেই। যোগাযোগ করবে কিভাবে?

দ্বীপবাসী অবাক হলো। এত বয়স্ক একজন মহিলাকে কেন এখানে এনে রাখা হলো? চোখে দেখতে পায় না। এই অসহায় মহিলা কিভাবে রাজবন্দী হন? এই মহিলা তো নিজে নিজে চলাফেরাও করতে পারেন না।

আশেপাশের মহিলারা কৌতূহলী হয়ে একজন দুজন করে জিহাদের রানির সাথে দেখা করতে আসতে শুরু করলো। সবাই অবাক হয়ে আবিষ্কার করলো, এই অচল বৃদ্ধা একটি সাক্ষাৎ বাঘিনী। তারা জানতে পারলো এই বৃদ্ধা খুবই সুন্দর কুরআন শরীফ পড়তে পারে। না দেখেই। কয়েকটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। আরও অনেক কিছুই জানে।

এবার স্ত্রীদের সাথে স্বামীরাও আসা শুরু করলো। কিছুদিন পর ছোট বাচ্চাদেরকেও নিয়ে আসতে শুরুলো। তিনি সবাইকে কুরআন শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। দ্বীপের মানুষেরা তাকে কুরআনের রানি বলে ডাকতে শুরু করলো।

দ্বীপের পুরো চিত্রটাই গেল বদলে। পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ-মক্তব প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করলো। মায়েরা নামাজ-কালামে মনোযোগী হলো। দ্বীপে শিক্ষাদীক্ষার হার বেড়ে গেল। সবার মুখেই এক নাম: আ-বূ বারবূ। রানি।

১৯০৮ সালে এই ইন্দোনেশিয়ান 'খানসা' ইন্তিকাল করেন। ডাচ সরকার তার সংবাদ পুরোপুরি চেপে গিয়েছিলো। কোন দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছে সেটাও মূল ভূখণ্ডের কেউ বের করতে পারেনি।

১৯৬০ সালে ডাচ সরকারের প্রকাশ করা কিছু নথিতে প্রথমবারের মতো ইন্দোনেশিয়ার সরকার জানতে পারে, দূর দ্বীপের সেই কুরআনের রানি আর তাদের জিহাদের রানি একই মহিলা। যার সন্ধান তারা এতদিন ধরে বের করার চেষ্টা করছিলো।

জীবন জাগার গল্প : ৩৮৫

ভদ্র চোর

প্রতিদিনের মতো আজও আসমা হায়দারী ঘর থেকে বের হলো। ম্যানহাটনের ডাউনটাউনের একটা নার্সারি স্কুলে চাকরি করে। বিয়ের পরই স্বামীর সাথে থাকার জন্যে, পাকিস্তান থেকে চলে এসেছে। স্কুলের চাকুরিটা পেতে তেমন বেগ পেতে হয়নি।

কথা ছিলো স্কুলের পর স্বামীর সাথে বোনের বাসায় বেড়াতে যাবে। আসমার ছোট বোনও স্বামীর সাথে এখানে থাকে। স্কুল থেকে একটু আগেই বের হয়ে গেছে আজ।

স্কুলের গেট দিয়ে বের হয়ে ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করছে, এমন সময় একটা কালো ছেলে বাইক চালিয়ে এসে, দ্রুত ছোঁ মেরে তার ভ্যাটিটি ব্যাগটা নিয়ে চলে গেল।

আসমা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাইকটা হাওয়া হয়ে গেল। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। পাশের এক মহিলা পুলিশে খবর দিতে বলল। আসমা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চুপচাপ চলে এল।

.

সে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লো। ব্যাগে এই মাসের পুরো বেতনটা তো ছিলই, পাশাপাশি জরুরি অনেক কাগজপত্রও ছিলো। ওগুলো না হলে এদেশে একদণ্ড চলা যাবে না। একদম অচল হয়ে পড়বে।

.

বোনের বাসায় আর গেল না। নিজের ঘরে ফিরে, বাড়তি মোবাইল দিয়ে নিজের নাম্বারে কল দিল। যা ভেবেছিল তাই- বন্ধ।

.

বোনকে জানিয়ে দিল, সে যেতে পারছে না। বোন পরামর্শ দিল, পুলিশে খবর দিতে। আসমা বলল,

—আচ্ছা! ভেবে দেখি, কি করা যায়।

.

আসমা নিজের নাম্বারে একটা মেসেজ পাঠালো,

= আমি নিশ্চিত, তুমি একজন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন যুবক। হয়তো পরিস্থিতির কারণেই তুমি ব্যাগটা ছিনতাই করতে বাধ্য হয়েছ। তুমি বিপদে পড়েই কাজটা করেছ। ঠিক আছে, তুমি ব্যাগের টাকাগুলো রেখে দাও। কিন্তু অন্য কাগজপত্রগুলো ফিরিয়ে দাও। ওগুলো তো তোমার কোনও কাজে আসবে না।

.

এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও কোন সাড়া মিলল না। এরপর আসমা দ্বিতীয় মেসেজ পাঠাল,

= আমি এখনো বিশ্বাস করি, তুমি একজন ভদ্র যুবক। শুধু এ কারণেই আমি এখনো পুলিশে খবর দেই নি। কখনো দিবও না। তুমি শুধু আমার কার্ডগুলো ফিরিয়ে দাও। সেগুলো তোমার কোনও কাজে আসবে না।

.

আরো একটা ঘণ্টা চলে গেল। কোনও প্রত্যুত্তর নেই। এর মধ্যে স্বামী চলে এল। বিরক্ত হয়ে বললো,

—আরে, সোজা আঙুলে কি ঘি উঠবে? চলো পুলিশকে জানাই।

—না, আরেকটু দেখি।

আসমা আরেকটা মেসেজ পাঠালো,

= দেখ, আমি আমি কিন্তু তোমাকে সত্যি সত্যি একজন ভাল মানুষ মনে করি। তার প্রমাণস্বরূপ আমি এখনো পুলিশে খবর দেইনি। তুমি আমার কাগজপত্রগুলোই শুধু পাঠিয়ে দাও। আমার ঠিকানা তো ব্যাগেই আছে।

.

আসমা স্বামীর বিরক্তি সহ্য করেই, একে একে উনিশটা মেসেজ পাঠাল। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লো। শেষ রাতের দিকে ডোরবেলের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেলো। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই গিয়ে দরজা খুলে দিল। দেখতে পেল,

= দরজার অদূরেই ব্যাগটা পড়ে আছে। সাথে একটা টকটকে লাল গোলাপ।

জীবন জাগার গল্প : ৩৮৬

কল্পজগত

এক লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখল একজন যুবতী রাস্তার ওপর ব্যথায় ছটফট করছে। লোকটা দৌড়ে গিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে লোকটাকে সহাস্যে বললো,

–সুসংবাদ, আপনি তো বাবা হতে যাচ্ছেন।

–বলছেন কি, আমি কেন বাবা হতে যাবো? আমি তো এই যুবতীকে রাস্তা থেকে উঠিয়ে এনেছি।

লোকটার কথা শুনে যুবতী রাগতস্বরে বললো,

–মিথ্যুক কোথাকার! তুমিই এই সন্তানের পিতা।

ডাক্তার লোকটার ডিএনএ টেস্ট করে বললেন:

–নাহ, আপনি সত্য বলেছেন, আপনি এর পিতা নন।

–আল হামদুলিল্লাহ।

এরপর ডাক্তার বললো,

–আরেকটা কথা বলতে বাকি আছে।

–কী?

–পরীক্ষায় ধরা পড়েছে, আপনি কখনো সন্তানের পিতা হতে পারবেন না। আপনি জন্মগতভাবেই বন্ধ্যা।

লোকটা মাথায় হাত দিয়ে বসে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলো।

–কাঁদছেন কেন?

–আমি বন্ধ্যা হলে, আমাদের সংসারে তিনটা সন্তান কোত্থেকে এল?

.

এমন সময় লোকটার ঘুম ভেঙে গেল। লোকটা খুশিতে ডগমগ হয়ে বললো,

–যাক বাবা বাঁচা গেল, স্বপ্নেই এসব উদ্ভট বিষয় ঘটছিলো তাহলে।

.

লোকটার প্রচণ্ড পানির তেষ্টা পেয়েছিল। উঠে গিয়ে ঢকঢক করে আধা জগ পানি পান করে ফেললো। হঠাৎ লোকটার মনে পড়লো,

–আরে এখন তো রমযান মাস। আমি না রোযা রেখেছি?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে নয়টা বাজে। আরে আমার অফিস! তিন লাফে দুদ্দাড় করে রাস্তায় নেমে এল। একটা প্রাইভেট গাড়ি চড়ে অফিসে এসে পৌছল। এসে দেখে অফিস বন্ধ। আজ জুমাবার।

জীবন জাগার গল্প : ৩৮৭

আপ্যায়ন

বাড়িতে মেহমান এসেছেন। এমন অসময়ে সাধারণত মেহমান আসেন না। বাড়িতে পুরুষ কেউ নেই। শুধু মা আর ছোট্ট মেয়ে। মেহমানকে দেখতেও বেশ সম্মানিত মনে হচ্ছে।

মা তার ছেটো মেয়েকে পাঠিয়ে মেহমানের প্রাথমিক অভ্যর্থনার কাজ সারলেন। মেয়ে ফিরে এসে মাকে জিজ্ঞেস করলো,

–আম্মু! মেহমান দাদুকে নাস্তা দিবে না?

–সেটাই তো ভাবছি।

মা চিন্তায় পড়ে গেলেন, এই অবেলায় হালকা নাস্তা দিবেন নাকি খাবার দিবেন। মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন,

–কী দেয়া যায় বলো তো মা?

–কেন, খাবার দিয়ে দাও।

–খাবার দিলাম, কিন্তু খিদে না থাকার কারণে খেলেন না, তখন?

–তাহলে?

–ঠিক আছে, এক কাজ করো, এক পেয়ালা কফি আর এক গ্লাস পানি নিয়ে যাও। খেয়াল রাখবে মেহমান দাদু প্রথমে কোন দিকে হাত বাড়ান, পানির গ্লাসের দিকে নাকি কফির পেয়ালার দিকে।

–কেন আম্মু?

–উনি যদি প্রথমে পানির গ্লাসের দিকে হাত বাড়ান তাহলে বুঝবো তার খিদে আছে। খাবার দিতে হবে।

জীবন জাগার গল্প : ৩৮৮

চোরের মনে পুলিশ পুলিশ

বুঝ হওয়ার পর থেকে কখনো ফজরের নামায কাযা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু আজ কিভাবে যেন কাযা হয়ে গেল মালিহার। স্বামী তো নামায-কালামের তেমন একটা ধার ধারে না। মালিহা মাঝে মধ্যে অবাক হয়ে ভাবে, তার কপালে আল্লাহর তা'আলা এমন স্বামী কেন রেখেছেন? নিশ্চয়ই এতে কোনও কল্যাণ আছে।

.

নামায কাযা হওয়ায় মালিহার আফসোসের আর সীমা রইল না। সারাদিন প্রতি নামাযের পরই কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইল। তারপরও মন শান্ত হলো না। গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে যাওয়ার পর আবার জায়নামাযে দাঁড়ালো। আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো। বারবার বলতে লাগলো,

–ইয়া আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিন। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমাকে বাঁচান। আমাকে বাঁচান।

.

তার কান্নার আওয়াজে স্বামীর ঘুম ভেঙে গেল। স্ত্রীর কান্না দেখে বিচলিত হয়ে পড়লো। এ গভীর রাতে কেন কাঁদছে মালিহা? কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে কী যেন ভাবল। তারপর শোয়া থেকে উঠে, দ্বিধাজড়িত পায়ে এগিয়ে গেল। স্ত্রীর হাত ধরে কোমল স্বরে বললো,

–আর কেঁদো না। আমি ওয়াদা করছি, তার কাছে আর যাবো না। থাক হয়েছে, আল্লাহর কাছে বিচার দিও না। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারিনি। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। কথা দিচ্ছি এবার থেকে নিজেকে সংশোধন করে ফেলবো।

জীবন জাগার গল্প : ৩৮৯

ভালো কথা

রাজা রাজ্যময় ঘোষণা দিলেন,

-যে আমার পছন্দমত ভাল কথা বলতে পারবে তাকে চারশ দীনার পুরস্কার দেয়া হবে।

রাজা ঘোষণা দিয়েই ভাল কথা শোনার আশায় শহর পরিক্রমণে বের হলেন। চলতে চলতে শহর পেরিয়ে শহরতলীতে পৌঁছলেন। দেখলেন,

এক বৃদ্ধ লোক যায়তুন গাছের চারা রোপণ করছে।

–আপনি যায়তুনের চারা লাগাচ্ছেন, সেটা তো প্রায় বিশ বছর পরে ফল দিবে। ততদিন কি আপনি বাঁচবেন?

–আমার পূর্বপুরুষগণ গাছ লাগিয়ে গেছেন, আমি তার ফল খেয়ে বড় হয়েছি। আমি গাছ লাগিয়ে গেলে আমার বংশধররা খেয়ে বড় হবে।

–খুব সুন্দর কথা বলেছেন তো! এই কে আছিস, মুরুব্বিকে চারশ দীনার দিয়ে দে।

পুরস্কার পেয়ে বৃদ্ধ মুচকি হাসল। রাজা অবাক হয়ে বললেন,

–হাসলেন কেন?

–আমি হেসেছি, যায়তুন গাছ ফল দেয় বিশ বছর পরে। আমার গাছটা লাগানোর সাথে সাথেই ফল দেয়া শুরু করেছে।

রাজা মুগ্ধ হয়ে তাকে আরও চারশ দীনার দিতে বললেন। দীনার পেয়ে বৃদ্ধ আবারও মুচকি হাসল।

–কী ব্যাপার, আবার কেন হাসলেন?

–যায়তুন গাছ বছরে একবার ফল দেয়। আমারটা দেখি লাগাতে না লাগাতেই দুইবার ফল দিয়ে ফেলেছে।

রাজা তো একেবারে মোহমুগ্ধ।

–এই, মুরুব্বিকে আরও চারশ দীনার দিয়ে দাও।

তারপর রাজা দ্রুত লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সেখান থেকে চলে এলেন। রাজার সাথে যাওয়া একজন জানতে চাইল,

–জাহাঁপনা! কথা শেষ না করেই চলে এলেন যে?

–আরে আর বলো না। বুড়ো যেভাবে শুরু করেছিল, আর কিছুক্ষণ থাকলে রাজভাঁণ্ডারেও টান পড়তে শুরু করতো, কিন্তু বুড়োর ভাল কথা ফুরোত না। আসলে ভাল কথা সবসময় আরেকটা ভাল কথাকে টেনে আনে, এর কোনও শেষ নেই।

জীবন জাগার গল্প : ৩৯০

ঘুড়ি

গ্রামে শুরু হয়েছে ঘুড়ি ওড়ানো উৎসব। বিকেল হলেই, ছেলে-বুড়ো সবাই ঘুড়ি নিয়ে মাঠে চলে আসে। রঙ বেরঙের ঘুড়ি।

আগামীকাল মূল প্রতিযোগিতা হবে। তাই আজ শেষবারের মতো যে যার ঘুড়িটা পরীক্ষা করে নিচ্ছে। কে কত সুতা ছাড়তে পারে, কার সুতোয় কত ধার সেটার পরীক্ষা চলছে।

.

হাসান তার আব্বুকে জিজ্ঞেস করলো,

–আব্বু! ঘুড়িটা তো অনেক ওপরে উঠেছে। আরও ওপর উঠতে দিন না!

–আর ওপরে ওঠানো তো সম্ভব নয়?

–কেন?

–আমাদের নাটাইয়ে যে আর সুতো নেই!

–তাহলে সুতোটা ছিঁড়ে দিলেই তো ঘুড়িটা আরও ওপরে উঠে যাবে!

–তুমি যা ভাবছ তা নয়। এই দেখ তোমার কথামতো আমি সুতো কেটে দিচ্ছি। দেখ কী ঘটে!

.

সুতো কেটে দেয়ার ঘুড়িটা আরও ওপরে উঠে যেতে লাগল। হাসান খুশিতে হাত তালি দিয়ে উঠলো। তাদের ঘুড়ি আজ সবার চেয়ে ওপরে। হাসানের আনন্দ দেখে আব্বু মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

.

একটু পরেই হাসানের মুখ কালো হয়ে গেল। ঘুড়িটা দোল খেতে খেতে, আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসছে। আব্বু সস্নেহে মাথায় হাত বুলিতে দিতে দিতে বললেন,

–বাবু সোনা! তোমার জীবনটাও এই ঘুড়ির মতো। বড় হলে, একটা সময় তুমি দেখবে, কিছু জিনিস তোমাকে সামনে যেতে দিচ্ছে না। পেছনে টেনে ধরে রাখছে। মনে হবে এগুলোর পিছুটান না থাকলে আমি আরও এগিয়ে যেতে পারতাম।

–সেগুলো কি আব্বু!

–এই ধর তোমার পরিবার, তোমার আত্মীয়-স্বজন, তোমার বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি। একটা ঘুড়িকে যেমন নাটাইয়ের সুতো স্থির থাকতে সাহায্য করে, তেমনি এরাও তোমাকে জীবনে সুস্থির থাকতে সাহায্য করবে।

নিরন্তর উঁচুতে ওঠা সহজ কিন্তু উঁচুতে উঠে সুস্থির থাকাটা খুবই কঠিন। তোমার পরিবার, তোমার আব্বু-আম্মুই তোমাকে সুস্থির থাকতে সাহায্য করতে পারে।

তাই জীবনে যত ওপরেই যাও, যত সফলই হও, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আব্বু-আম্মু থেকে আলাদা হয়ো না।

–জি আব্বু!

জীবন জাগার গল্প : ৩৯১

তেলাপোকা

মাহমুদ শায়ের। একজন পেশাদার বক্তা। তার নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল আছে। আরব বিশ্বের বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোতে তিনি বক্তব্য দিয়ে বেড়ান।

তিনি মূলতঃ কর্মশক্তি, প্রাণশক্তি, উদ্যম এসব বিষয় নিয়েই কথা বলেন। যাতে কর্মীদের মধ্যে কাজের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। তিনি সম্প্রতি এক বক্তব্যে একটা ঘটনা বলে তারা বক্তব্য শুরু করেছিলেন,

–গত মাসের শেষদিকে আমি বেলজিয়াম গিয়েছিলাম। 'আন নাফত' কোম্পানীর একটা এসাইনমেন্ট নিয়ে। বিকেলে নাস্তা করতে গেলাম একটা ক্যাফেতে।

•

আমরা কোম্পানীর কয়েকজন মিলে একটা টেবিল আগেই বুক করে রেখেছিলাম। সেখানেই বসলাম। বিপরীত পাশেও একদল মেয়ে বসেছিল। তারা বোধহয় অন্য শহর থেকে ট্যুরে এসেছে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তাই মনে হচ্ছিল।

ওয়েটার তাদেরকে খাবার দিয়ে গেল। তারা খাবার খেতে শুরু করে দিল। হঠাৎ একটা তেলাপোকা উড়ে এসে একজনের গায়ে পড়লো। মেয়েটা লাফিয়ে উঠে হৈ চৈ শুরু করে দিল। কাপড় ঝাড়া দিয়ে তেলাপোকাটা ফেলে দিল। তেলাপোকা উড়ে গিয়ে আরেক জনের ওপর পড়লো। তারপর আরেক জনের ওপর। পুরো ক্যাফেতেই হুলুস্থুল কাণ্ড বেঁধে গেল।

সব শেষে তেলাপোকাটা উড়ে গিয়ে পড়লো একজন ওয়েটারের ওপর। ওয়েটার একটুও চমকাল না। খানিক চেয়ে থেকে তেলাপোকটার গতিবিধি লক্ষ করলো। তারপর দুই আঙুলে ধরে সেটাকে জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলল। পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেল। যে যার টেবিলে গিয়ে বসল।

আমি এতক্ষণ চেয়ে চেয়ে পুরো দৃশ্যটা দেখছিলাম। সবকিছু থিতিয়ে আসার পর আমার মনে কয়েকটা চিন্তা এলো।

এক: এতক্ষণ যে ঘটনা ঘটে গেল, মেয়েগুলো যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলল, সেটার জন্যে দায়ী কে? তেলাপোকা?

যদি তাই হয় তাহলে তেলাপোকা তো ওয়েটারের ওপরও পড়েছে, কই সে তো লাফায়নি? বরং শান্তভাবে পুরো পরিস্থিতিটাকেই সামলেছে।

=তাহলে বোঝা গেলো, এই সমস্যার জন্যে দায়ী তেলাপোকা নয়। বরং মহিলারা। কারণ তারা এই পুঁচকে পোকাকে দক্ষ হাতে সামলাতে পারেনি।

দুই: আমার আরও মনে হল, পিতা, বস বা অন্য কেউ যে আমাকে বকা দেয়, সে বকাটা আমাকে বিরক্ত করে না। বরং তাদের বকা শুনে নিজের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া বিরক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাটাই আমাকে বিরক্ত করে।

তিন: রাস্তার যানজট আমাকে বিরক্ত করে না, বরং যানজটে আটকে থাকার ফলে সৃষ্টি হওয়া বিরক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার অক্ষমতাই আমাকে বিরক্ত করে।

চার: জীবন চলার পথে, বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঝামেলা পাকায় না। দুর্ঘটনায় পড়ে আমার বেসামাল প্রতিক্রিয়াই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঝামেলা পাকায়।

পাঁচ: আমি সেদিন, ক্যাফেতে বসে বসে সিদ্ধান্ত নিলাম:

= আমি এবার থেকে কোনও দুর্ঘট পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে, সাথে সাথে তেতে উঠেই প্রতিক্রিয়া দেখাবো না। বরং সমস্যার সমাধানে কিভাবে ইতিবাচক সাড়া দেয়া যায় তা নিয়ে ভাববো।

ছয়: মহিলারা সেদিন তেলাপোকার কারণে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। আর ওয়েটার ব্যতিব্যস্ত না হয়ে সমাধানের জন্যে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছিল।

সাত: প্রতিক্রিয়া দেখানোটা সব সময়ই তাৎক্ষণিক তড়িৎ আবেগ থেকে আসে, আর যুক্তিসঙ্গত সাড়া দানটা আসে সুচিন্তিত পরিকল্পনা থেকে।

আট: একজন সুখী মানুষ ঠিক এজন্য সুখী নয় যে, তার সবকিছু ঠিক আছে। সে সুখী, কারণ তার সুখী হওয়ার মতো দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

জীবন জাগার গল্প : ৩৯২

ডিম চুরি

হেলেন কেলার। আমেরিকার আলবামা রাজ্যের এক মহিলা। বৃদ্ধা ও স্বামী-সন্তান পরিত্যক্তা। এক সুপার শপের সিকিউরিটি বিভাগ থেকে হেলেনের নামে অভিযোগ গেল পাশের পুলিশ বুথে।

ক্লোজসার্কিট ক্যামেরা ফাঁকি দিয়ে কী যেন সে চুরি করেছে। পুলিশ সাথে সাথে তদন্তে এল। জিজ্ঞাসাবাদের পর হেলেন স্বীকার করলো।

–আমি পাঁচটা ডিম চুরি করেছি।

–কেন এই সামান্য কয়টা ডিম চুরি করতে গেলে?

–গত দুদিন ধরে কিছুই খাইনি। ঘরে কোন খাবার ছিল না। টাকা তো নেই সেই কবে থেকে।

পুলিশ অফিসার মুরাদ ডেভিস বুড়ির অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলল। বুড়িকে গ্রেফতার-না করে পাশের দোকান থেকে পাঁচটা ডিম কিনে সুপার শপে দিয়ে এলো।

দু'দিন পরে, মুরাদ একঝুড়ি খাবার কিনে বুড়ির কুঠুরিতে নক করলো। বুড়ি তো ঘুলঘুলি দিয়ে পুলিশ দেখেই ভয় পেয়ে গেল। দরজা খুলে আগে বেড়ে বলে উঠলো,

–সার্জেন্ট, আজ তো আমি কোনও চুরি করিনি। তবে আমাকে গ্রেফতার করলে ভাল হয়। অন্তত খাঁবারের চিন্তাটা দূর হতো।

–না না, আজ গ্রেফতার করতে আসিনি। সেদিন করিনি, আজ কেন করবো? মানুষ আমাদেরকে যতই খারাপ বলুক আমরা কিন্তু কখনো কখনো কানুনের চেয়ে মানবতাকেই প্রাধান্য দেই।

জীবন জাগার গল্প : ৩৯৩

দেখা ও শোনা

বিশিষ্ট মুফাসসির মুকাতিল বিন সুলাইমান। আব্বাসী খলীফা মনসুর যেদিন খলীফা হলেন, সেদিন ঘটনাক্রমে খলীফার সামনে পড়ে গেলেন। খলীফা তখন মুকাতিল বিন সুলাইমানকে বললেন,

–আপনি তো এ যুগের একজন বড় আলেম। আমাকে কিছু নসীহত করুন।

মুকাতিল বিন সুলাইমান বললেন,

–আমি যা দেখেছি তা থেকে নসীহত করবো নাকি যা শুনেছি তা থেকে?

–যা দেখেছেন তা থেকেই কিছু বলুন।

–ইয়া আমীরাল মুমিনীন! উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) -কে দেখেছি। তার এগারজন সন্তান ছিলো। তিনি ইন্তিকালের সময় আঠারোটি দীনার রেখে গিয়েছিলেন। তার কাফন-দাফনে ব্যয় হয়েছিলো পাঁচ দীনার। কবরের জায়গা ক্রয় করতে ব্যয় হয়েছিলো চার দীনার। বাকি নয় দীনার তার সন্তানদেরকে ভাগ করে দেয়া হয়েছিলো।

খলীফা হিশাম বিন আবদুল মালিকও এগার সন্তানের জনক ছিলেন। তার ইন্তিকালের পর প্রতিটি সন্তান পেয়েছিলো এক লাখ দীনার করে।

আমীরাল মুমীনিন! আমি দেখেছি, একসময় উমর ইবনে আবদুল আযীযের এক সন্তান আল্লাহর রাস্তায় একশত উৎকৃষ্ট ঘোড়া দান করছেন। আবার এও দেখেছি যে, হিশাম বিন আবদুল মালিকের এক সন্তান রাস্তায় বসে বসে ভিক্ষা করছে।

মৃত্যুশয্যায় উমর বিন আবদুল আযীযকে একজন প্রশ্ন করেছিলো,

–সন্তানদের জন্য আপনি কী রেখে যাচ্ছেন?

–আমি তাদের জন্য আল্লাহর ভয় (তাকওয়া) রেখে যাচ্ছি। যদি তারা নেককার হয়, তাহলে তো কথাই নেই। আল্লাহ নেককারদের অভিভাবক (আল্লাহু ইয়াতাওয়াল্লাস সালিহীন)। আর যদি তারা বদকার হয়, তাহলে আমি তাদের বদকাজে সাহায্য করার জন্য কীভাবে দিরহাম-দীনার রেখে যেতে পারি?

জীবন জাগার গল্প : ৩৯৪

বাদশাহর মসজিদ

এক বাদশাহর খেয়াল চাপলো একটা মসজিদ বানাবেন। এই মসজিদটা হবে সম্পূর্ণ তার খরচে। আর কারও কোনরকমের আর্থিক সহযোগিতা থাকবে না। সবাইকে সতর্ক করে দেয়া হলো, কেউ যেন কোন রকমের সাহায্য-সহযোগিতা না করে। মসজিদ নির্মাণ শেষ হলো। মসজিদের শাহী গেইটের সামনে বাদশাহর নামাঙ্কিত নামফলকও বসানো হলো। রাতে বাদশাহ স্বপ্নে দেখলেন, আকাশ থেকে ফেরেশতা নেমে এসেছে। ফেরেশতা মসজিদের সামনে রাখা নামফলকে উৎকীর্ণ তার নামটা মুছে এক মহিলার নাম লিখে রাখলো। বাদশাই হতভম্ব হয়ে ঘুম থেকে জাগলেন। এটা আবার কেমনতরো স্বপ্ন? একজন সেপাই পাঠিয়ে যাচাই করলেন। নাহ! তার নামটা আগের মতোই লেখা আছে।

সবাই বললো, এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছুই নেই। এটা অলীক স্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন। বাদশাহ মেনে নিলেন। কিন্তু পরের রাতে আবার একই স্বপ্ন দেখলেন। ধড়মড় করে উঠে বসলেন। সাথে সাথে এই মাঝরাতেই একজনকে পাঠালেন। লোকটা দেখে এসে জানালো, বাদশাহর নাম ঠিকমতই আছে। বাদশাহ কিছুটা আশ্বস্ত হলেন।

পরের রাতে আবারও একই স্বপ্ন। আজ ফেরেশতা যখন মহিলার নাম লিখছিলো, বাদশাহ গভীরভাবে নামটা লক্ষ করলেন। সকালে উঠেই এই নামের মহিলাকে দরবারে হাজির করতে বললেন। দরবারে হাজির করার পর দেখা গেলো একজন বৃদ্ধ মহিলা। বৃদ্ধা ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। বাদশাহ অভয় দিয়ে বললেন,

–বুড়ি মা! তুমি কি আমার মসজিদটা নির্মাণের কাজে কোন সহযোগিতা করেছিলে?

–হুযুর! আমি একজন গরীব অসহায় মহিলা। আমার সাহায্য করার সামর্থ্য কোথায়?। শুনেছি, আপনি সহযোগিতার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। এরপরও কি কারো সাহায্য করার সাহস হবে?

–বুড়ি মা! ভালো করে চিন্তা করে বলো। তুমি কি কোন সাহায্যই করোনি? একেবারেই না?

–আল্লাহর কসম! হুযুর, আমি কিছুই করিনি। তবে ....

–তবে কি?

–এটাকে সাহায্য বলা হবে কিনা বুঝতে পারছি না। একদিন আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, একটা গাধা রশি দিয়ে বাঁধা। পিঠে বিভিন্ন সরঞ্জাম। বোঝার চাপে গাধাটা খুবই কষ্ট পাচ্ছিলো।

গাধাটার অদূরেই রাখা ছিলো একটা পানির ছোট্ট গামলা। গাধাটা গলা বাড়িয়ে গামলা থেকে পানি পান করতে চাইছিলো। কিন্তু রশির কারণে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। বেশি টানটানি করায় গাধাটার গলায় ক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছিলো। আমি তখন পানির গামলাটা অনেক কষ্টে গাধার মুখের কাছে এনে দিয়েছিলাম। আমি শুধু এটুকুই করেছিলাম।

–হুমম! তুমি এ কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছিলে। আল্লাহ তোমার কাজ কবুল করে নিয়েছেন। আর আমি মসজিদটা নির্মাণ করেছিলাম আমার নামের জন্য। তাই আমার এই আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি।

বাদশাহ নয়া ফরমান জারি করলেন,

–মসজিদের নাম এখন থেকে এই বুড়ি মার নামেই হবে।

জীবন জাগার গল্প : ৩৯৫

বুযুর্গের দূরদৃষ্টি

ভরা মজলিসে বয়ান চলছে। একজন বুযুর্গ অত্যন্ত দরদমাখা স্বরে নসীহত করছেন। শ্রোতারাও খুবই মনোযোগের সাথে নসীহত শুনছে। কেউ নড়াচড়া করছে না। ওঠাউঠি করছে না। ওয়াজ শেষ হলো। শ্রোতারা একে একে উঠে চলে যাচ্ছে।

এবার খাস মজলিস হবে। বিশেষ মুরীদরা এই বয়ানে বসবে। এখানে সবার বসার অনুমতি নেই। এমন সময় একজন লোক এলো। আবেদন করলো,

–হুযুর! আমি তো বয়ানটা শুনতে পারিনি।

–ঠিক আছে বসো। তোমাকে বয়ানটা শুনিয়ে দিচ্ছি।

বুযুর্গ পুরো বয়ানটা আগাগোড়া শুনিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়বার বয়ান শেষ করতে না করতেই আরেক মুরিদ এসে হাজির।

–৩

–হুযুর! আমি বয়ানটা শুনতে পারিনি।

–ঠিক আছে বসো।

আবার বয়ানটা শুনিয়ে দিলেন।

উপস্থিত মুরিদরা ব্যাপারটায় উসখুস করতে লাগলো। এভাবে একই বয়ান বারবার শুনতে শুনতে তাদের মধ্যে কিছুটা অমনোযোগিতা এসে গেলো। একজন আর থাকতে না পেরে মুখ ফসকে বলেই ফেললো।

–হুযুর! এভাবে পুরো বয়ানের পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন কী? সংক্ষেপে শুনিয়ে দিলেই তো হয়। অথবা আমাদের কাউকে দায়িত্ব দিলেই তো কাজটা হয়ে যায়। আপনি অন্যদেরকে সময় দিতে পারেন।

বুযুর্গ বললেন,

–হ্যাঁ, তাও হয়। প্রস্তাবটা উত্তম। তবে কথা হলো, আমি ভরা মজলিসে যখন বয়ান করি তখন কয়েকটা উদ্দেশ্য থাকে।

প্রথমতঃ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বয়ান করি। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। সেটা প্রথমবার যেমন ছিলো দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও সেই একই লক্ষ্য ছিলো। সুতরাং আমার বিরক্ত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আমার কাছে শ্রোতার সংখ্যা কখনোই বিবেচ্য নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টিই বিবেচ্য।

দ্বিতীয়তঃ আমি চাই কথাটা শ্রোতারা ভালোভাবে বুঝে নিক। তো আমার কথা, আমার চেয়ে আর বেশি কে বোঝাতে পারবে? হ্যাঁ, আমি যখন থাকবো না বা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বো তখন ভিন্ন হিসাব।

তৃতীয়তঃ বলা যায় না, কার উসীলায় আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন! ভরা মজলিসে বয়ান করলাম, কারো হিদায়াত নসীব হলো না। আবার একজনকে আলাদা করে বয়ান করলাম, তার হিদায়াত নসীব হয়ে গেলো। তাহলে এই একজনের বয়ানটাই বেশি ভালো নয় কি? সেজন্য নাজাতের কোনো সম্ভাবনাই আমি হাতছাড়া হতে দিই না।

জীবন জাগার গল্প : ৩৯৬

মায়ের দুঃখ!

সংস্থাটির কাজ হলো, বয়স্কা মায়েদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে গবেষণা করা। তাদের মন-মানসিকতা যাচাই করা। বিশেষ করে সন্তানের বিয়ে হয়েছে এমন মায়েদের ওপর একটা জরিপ চালানো হলো, রিপোর্টে অদ্ভুত সব তথ্য উঠে এলো। বেশ কয়েকজন মা নিজ সন্তান সম্পর্কে বক্তব্য তুলে ধরলেন।

.

প্রথম মা :

–আমি আমার ছেলে-মেয়েকে খুবই ভালোবাসি। মেয়েটা প্রায়ই আমাকে দেখতে আসে। তার বাসাও কাছেই। সাথে ছোট্ট নাতিটাও আসে। আমার খুবই আদরের। সবসময় একটা বিষয় লক্ষ্য করি, নাতিটা এখানে এসেই হুটোপুটি খেতে শুরু করে। বাসার প্রতিটি বস্তুই তার খেলার সামগ্রীতে পরিণত হয়। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো, মেয়ে আমার একবারও তার ছেলেকে এসব আগোছালো করতে নিষেধ করে না। বরং উল্টো আরও উপভোগ করে!

.

দ্বিতীয় মা :

একই শহরেই থাকি আমরা। তবে মেয়েজামাই প্রতিসপ্তাহে একদিনের জন্যে বাইরে যায়। মেয়েটা সেদিন আমার সাথে থাকতে আসে। এসেই শুরু করে অভিযোগ। তার একমাত্র ছেলের বিরুদ্ধে। সে এটা খায় না। ওটা মুখে তোলে না। এটা করে না, ওটা করে না। আর নাতিটা? সে তো একটা বারের জন্যেও আমার কোলে আসে না।

কিছুক্ষণ একগাদা অভিযোগ করে, মেয়েটা ছেলেকে নিয়ে অন্য কামরায় চলে যায়। সেখানেই সারাদিন টিভি দেখে। আর নাতিটা পুরো কামরা হুলুস্থূল মাতিয়ে রাখে। বিকেলে যখন তারা ফিরে যায়, তখন পুরো কামরাটা মাছের বাজারের মতো হয়ে থাকে। কাজের বুয়া আর আমি মিলে কামরাটাকে ঠিক করতে গভীর রাত হয়ে যায়।

.

তৃতীয় মা :

ছেলের সাথে এক বাসাতেই থাকি। আমার খুবই ইচ্ছা করে, নাতিটার সাথে একটু কথা বলি। তার হাত ধরে একটু হাঁটাহাঁটি করি। তার সাথে খেলা করি। কিন্তু অনেক সময় এমন হয়, সারাদিনে একটিবারের জন্যেও তাকে চোখের দেখাটাও দেখি না। আমি আব্দার করলে, ছেলে আর পুত্রবধূ বলে,

–সে পড়ছে। এখন দেখা করার সময় নেই। তার পড়ার অনেক চাপ যাচ্ছে। বিকেলে আবার স্যার আসবে। এখন ড্রয়িং করছে। রাতে ইংলিশ মুভি দেখতে হয়।

–তাহলে বৌমা! ছুটির দিনটা তো সে আমার সাথে থাকতে পারে?

–এই একটা দিন তাকে ফ্রি পাই। সেদিন তো আমরা বাইরে খেতে যাই!

চতুর্থ মা :

মেয়েটা প্রতিবারই এসে গল্প জুড়ে দেয়, সে নতুন কী কী খাবার রান্না করতে শিখেছে। স্বামীকে কোন কোনও ডিশ খাইয়ে চমকে দিয়েছে। পার্টির সবাই তার কোন কোন রান্নায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। অনেক সময় ফোনেও নিজের রান্নার খোশবাই ছড়ায়। কিন্তু একটিবারের জন্যেও, আমার কাছে আসার সময়, নিজের হাতের কোনও রান্না আনে না। আমিও কিছু বলি না। কারণ সে যখনই আসে, নিজেকে এতবেশি ক্লান্ত দেখায়, যেন সে কাজ করতে করতে মরে যাচ্ছে। এখানে একটু বিশ্রাম নিতে এসেছে। আরও কষ্টের বিষয় হলো, মাঝে মধ্যে সে আমার বাসা থেকেই নতুন কিছু রান্না করে নিয়ে যায় স্বামীর জন্যে। আমার জন্যে এক ফোঁটা খাবার রেখে যাওয়ার কথাও তার মনে থাকে না।

পঞ্চম মা :

ছেলে-বৌমা প্রতি সপ্তাহেই বেড়াতে যায়। সাথে নাতনিটাকেও নিয়ে যায়। আমার খুবই ইচ্ছা করে, একবার তাদের সাথে যাই। কতদিন বাইরে যাইনি। বেড়াতে বের হইনি! একটা মাত্র ছেলে। তাকে ছাড়া তো আমার চলে না। কিন্তু সে ভুলেও কোনও দিন আমাকে বললো না,

–চলো মা! আজ আমাদের সাথে বেড়িয়ে আসবে!

ষষ্ঠ মা :

মেয়েটা এসেই বাড়ির চাকর-বাকরদেরকে বকাবকি শুরু করে। নানা দোষ ধরে। তারপর শুরু হয় বৌমাদের ভুল ধরা। মায়ের বাড়ির সবকিছুতেই সে দোষ খুঁজে পায়। সবাইকেই সে সমালোচনাযোগ্য মনে করে। সে মনে করে, এ-বাড়ির সবকিছুই এখনো তার পূর্ণ মালিকানাধীন। আমি তাকে অনেকবার বুঝিয়েছি।

–শোন, তুই সবকিছুতেই কেন নাক গলাতে যাস? চাকর-বুয়ার না হয় ভুল হয়। কিন্তু বৌমাদের সাথে তো তোর একটু আড় রেখে কথা বলা উচিত। ভুল হলে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলে হয় না?

–বুঝেছি মা! তুমি আমাকে এখন আর এ বাড়ির কেউ মনে করো না। পর ভাবো। আমার স্বামী গরীব বলে আমার কোনও দাম নেই। উঁ উঁ উঁ!

.

সপ্তম মা :

স্বামীর সাথে ঝগড়া হলেই সে বারবার ফোন করে। নিজের দুঃখ দুর্দশার কথা জানায়। কিন্তু একটিবারের জন্যেও আমার কোনও দুঃখ-কষ্ট আছে কি না, তা জানতে চায় না। আর স্বামীর সাথে মিটমাট হয়ে গেলে মেয়ে মাসে একবারও আমার সাথে যোগাযোগ করে না। আমি ফোন করলে, সে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে হাই-হ্যালো করেই ফোন রেখে দেয়। অথচ সে নিজের দুঃখের কথা জানানোর সময় ঘণ্টাকে ঘণ্টা কথা বলে যায়!

.

অষ্টম মা :

আমি জানি বৌমা আমার প্রতি বেজায় নাখোশ। কারণ আমি ছেলের কাছে বলেছিলাম, সে চাকরির কাজে বাইরে গেলে আমি একা হয়ে পড়ি।

–কেন?

–তুই থাকলে তো রাতের বেলা হলেও তোর দেখা পাই। কিন্তু তুই না থাকলে, ঘরটা একদম খালি পড়ে থাকে।

–নাতির সাথে কথা বলবেন?

–তাকে কাছে পেলে তো!

–কাছে পাবে না কেন!

-তারা তো বাসায় থাকে না। তুই বের হওয়ার সাথে সাথেই নানার বাড়ি চলে

যায়! আমি বুড়ো মানুষ কখন কী হয়ে যায়! তুই একজন ছোট্ট মেয়ে দেখে দে না আমার জন্যে?

.

ছেলেকে অনেক বলেছি, কিন্তু কাজ হয়নি।

.

=আরও অনেক মায়ের দুঃখের কথা রয়ে গেলো। ইনশা আল্লাহ পরে হবে।

জীবন জাগার গল্প : ৩৯৭

বুযুর্গের জবাব

একজন বুযুর্গ। সারাদিন ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকেন। মুরীদদের তা'লীম-তারবিয়তে সময় ব্যয় করেন। এক ইহুদি এসে বুযুর্গকে বললো,

–হুযুর! একটা প্রশ্ন ছিলো। আমরা যখন সিনাগগে গিয়ে জিহোভার উপাসনা করি, তখন আমাদের মনোযোগ তালমুদ পাঠের দিকেই নিবিষ্ট থাকে। অন্য কোন দিকে মন যায় না। কিন্তু আমি আপনার খানকার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রায়ই আপনার মুরীদদেরকে বলতে শুনি, ইবাদতে মনোযোগ থাকে না। নামাযে দাঁড়ালে নানা ওয়াসওয়াসা এসে মাথায় ভর করে। আমার প্রশ্ন হলো, এমনটা কেন হয়?

বুযুর্গ উত্তর দিলেন,

–মনে করুন দুইটা ঘর। একটা ঘর আসবাবশূন্য। আরেকটা ঘর ধন-সম্পদে ভর্তি। এখন বলুন তো, চোরের দৃষ্টি কোন ঘরের প্রতি আকৃষ্ট হবে?

–ধন-সম্পদে ভর্তি ঘরটার প্রতি।

–ঠিক এমনি একজন মুসলমানের অন্তর ঈমানের নূরে পরিপূর্ণ। আর কাফেরের হৃদয়ে ঈমানের লেশমাত্র নেই। মুসলমানের হৃদয় হলো আল্লাহর জন্য আর কাফেরের হৃদয় হলো শয়তানের জন্য।

আর শয়তানের কাজ হলো ঈমান নষ্ট করা। ঈমান থাকে মুমিনের অন্তরে। তাই শয়তানের দৃষ্টিও পড়ে সেদিকে।

জীবন জাগার গল্প : ৩৯৮

অন্ধ ও খোঁড়া

এক গাঁয়ে একজন খোঁড়া লোক বাস করতো। তার চলাফেরা করতে খুবই কষ্ট হতো। পাড়া-প্রতিবেশীর সাহায্যেই তার দিন গুযরান হতো। অতীব প্রয়োজন ছাড়া সে পারতপক্ষে ঘর থেকে বের হতো না। যেদিন গ্রামের হাটবার সেদিন লোকটা কষ্ট করে হলেও একবার বাজারে যেতো। এদিন তার বেশ আয় হয়। মানুষ বাজারের দিন অন্যদিনের তুলনায় উদার থাকে। টাকা-পয়সার পাশাপাশি হাটুরেরা তাকে এটা-সেটা খেতে দেয়। কেউ কেউ দয়াপরবশ হয়ে চা দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে সিঙাড়া-জিলিপি খাওয়ায়।

এসবের লোভেই শত কষ্টকর হলেও লোকটা বাজারে হাজিরা দেয়। আজো হাটবার। সকাল সকাল বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। আস্তে আস্তে পথ চলছে। বাড়ি থেকে কিছুদূর আসার পর দেখলো, একজন অন্ধ লোক হাতড়ে হাতড়ে বাজারের দিকে যাচ্ছে। তাকে দূর থেকে ডাক দিয়ে থামালো।

–কী ভাই কোথায় যাচ্ছ?

–এই একটু বাজারে যাচ্ছি।

–তাহলে তো দু'জনের গন্তব্য মিলে গেলো।

দু'জন একটা গাছের ছায়ায় বসে বসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললো। সুখ-দুঃখের আলাপ করলো। খোঁড়া লোকটা একটা প্রস্তাব দিলো অন্ধকে:

–চলো আজ থেকে আমরা দু'জন মিলে একটা দল গঠন করি। তুমি চোখে দেখ না, আমি পথ চলতে পারি না। তুমি আমাকে কাঁধে নিয়ে পথ চলবে, আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাবো।

–উত্তম প্রস্তাব। চলো, তা-ই করা যাক।

দু'জনে পথ চলতে চলতে বাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। হঠাৎ খোঁড়া লোকটা বললো,

–থামো থামো! সামনে দেখছি রাস্তার ওপর একটা থলে পড়ে আছে।

তারা থলেটা কুড়িয়ে নিল। খুলে দেখে ভেতরে অনেক টাকা।

খোঁড়া লোকটা বললো,

–এই থলের মালিকানা আমার। কারণ, আমিই এটাকে দেখেছি।

–অসম্ভব! এই থলে আমার। আমি পায়ে হেঁটে কষ্ট করে এতদূর না আনলে তুমি এত তাড়াতাড়ি আসতেই পারতে না।

দুজনে তুমুল ঝগড়া লেগে গেলো। তাদের ঝগড়া দেখে পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক পথচারী কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলো। উভয় পক্ষের কথা শুনে লোকটা বললো,

–তোমরা দু'জনেই যৌথভাবে এই থলের মালিক। দু'জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই থলে পাওয়া গিয়েছে।

লোকটা এই সমাধান দিয়ে চলে গেল। কিন্তু দু'জনের ঝগড়া থামল না। একটু পরে আরেক লোক এলো। তাকে দু'জনে পুরো ঘটনা খুলে বললো। সব শুনে লোকটা বললো,

–তোমরা থলেটা কোথায় পেয়েছ বলো দেখি?

–ঐ যে, ওখানে।

লোকটা টাকাভর্তি থলেটা নিয়ে দৌড় দিল। অনেক দূরে গিয়ে, আগের মতো ছুটতে ছুটতে বললো,

–তোমাদের মধ্যে যে আমাকে আগে ছুঁতে পারবে, সেই থলের মালিক হবে।

জীবন জাগার গল্প : ৩৯৯

নেয়ামতের কদর

শহরের মানুষজন খুবই অকৃতজ্ঞ। নিজেদের মাঝে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ নেই তো নেই, আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের প্রতিও কৃতজ্ঞতা নেই। ইমাম সাহেব অনেক চেষ্টা-তদবির করেও মানুষতে দ্বীনমুখী করতে পারলেন না। আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি শোকরগুযার বানাতে পারলেন না। একদিন আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে সকালে সূর্য উঠলো না। পুরো দুনিয়া অন্ধকার হয়ে থাকলো। কৃষকরা কাকডাকা ভোরে উঠে দেখলো এখনো চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তারা ক্ষেত-খামারে যেতে পারলো না। আলোর অপেক্ষায় বসে রইলো। চাকরিজীবীরা অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে বসে রইলো, সূর্যের দেখা নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলের ব্যাগ গুছিয়ে বসে রইলো, সূর্যের দেখা নেই। দিকে দিকে মহা হৈ চৈ-শোরগোল শুরু হয়ে গেলো। বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটলো। শহরের কলকারখানাগুলো আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে গেলো।

প্রচণ্ড শীত নামলো শহরে। শিশুরা ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেলো। বুড়ো-বুড়িরা শীতে জমে যাওয়ার যোগাড়।

শহরের অধিবাসীদের মন অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠলো। কেউ কিছু বলতে পারছে না। কেন এমন হলো, কোথায় কী সমস্যা হলো কেউ ধরতে পারছে না। সন্ধ্যা নাগাদ যে যত রিজার্ভ ফুয়েল আর জ্বালানি দ্রব্য ছিলো সব ফুরিয়ে গেলো।

দিন শেষে রাত এলো। রাত হলো আরো ভয়াবহ। আকাশে তারা নেই, চাঁদ তো এমনিতেই নেই। আকাশে দূরের কোন শহরের আলোর বিচ্ছুরণও নেই।

সবাই মৃত্যুভয়ে কাতর হয়ে পড়লো। রাত যতই গভীর হতে লাগলো আর্তনাদ আর আহাজারিতে চারদিক ভরে উঠতে থাকলো। ঘড়ির কাঁটা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিলো। সবাই অধীর অপেক্ষায় ছিলো, আজ সূর্য উঠবে। চারদিক আলোয় ঝলমল করবে।

সবার আশাকে সত্য প্রমাণ করে সূর্য উঠলো। শহরের মানুষ একযোগে ঘরদোর ছেড়ে বাইরে বের হয়ে এলো। নিজেদের অজান্তেই আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় করতে লাগলো। সূর্যকে যথাসময়ে উদিত করার জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় সবাই নুয়ে পড়লো।

লোকদের কৃতজ্ঞ গদগদ অবস্থা দেখে ইমাম সাহেব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

–আজ তোমরা শুকরিয়া আদায় করছো? এই সূর্য কিন্তু প্রতিদিনই উদিত হয়েছিলো। এতদিন তোমাদের এই শুকরিয়া কোথায় ছিলো?

আল্লাহ তা'আলা এই নেয়ামতকে প্রতিদিনই আমাদেরকে দান করে আসছেন। আমরা তার কদর করিনি। সেটার মূল্য বুঝিনি। এই বিরাট নেয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি নি। শুধু একদিন নেয়ামত উঠিয়ে নেয়ার পরই তোমাদের টনক নড়েছে।

জীবন জাগার গল্প : ৪০০

চোর প্রতিবেশী

ছোট্ট একটা মাটির ঘর। এক পৌঢ় দম্পতি বাস করে এই ঘরে। দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকার পর আল্লাহ তা'আলা শেষ বয়েসে তাদেরকে একটা পুত্র সন্তান দান করেছেন।

ছোট ছেলেটার জন্য স্বামী-স্ত্রীর চিন্তার শেষ নেই। বেশি বয়েসের সন্তান। তাদের পর সন্তানের দেখাশোনা কে করবে, এ ভাবনা দু'জনকে সারক্ষণ কুরে কুরে খায়। দু'জনেরই বিশ্বাস, আল্লাহ যেহেতু এত পরে সন্তান দিয়েছেন, লালনপালনের বন্দোবস্তও তিনিই করবেন।

এক রাতে, বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। ঝড়-তুফানে গাছের ডালপালা মটমট করে ভাঙছে। এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। স্বামী উঠে দরজাটা খুলে দিলেন। দেখলেন, পাশের বাড়ির রমিজ মিয়া দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। পুরো শরীর কাদা-পানিতে লেপ্টানো।

–চাচাজি! আমার ঘরটা ঝড়-তুফানে ধ্বসে পড়েছে। আজকের রাতটুকু আপনার ঘরে থাকার জায়গা হবে?

–কেন হবে না, অবশ্যই হবে। এসো, ভেতরে এসো।

রমিজ মিয়াকে রাতের মত থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

শোয়ার সময় স্ত্রী বললো,

–রমিজ মিয়ার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। সে তো সুবিধের লোক নয়।

–থাক, বেচারা বিপদে পড়ে এসেছে।

পরদিন সকালে রমিজ মিয়া বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে সামনে এসে বললো,

– চাচাজান, আমার কাছে ঘরদোর ঠিক করার মতো কোন টাকা- পয়সা নেই। যদি কিছু দিতেন?

বালিশের নীচে রাখা থলে থেকে টাকা বের করে দিলেন। রমিজ মিয়া টাকা নিয়ে চলে গেলো।

কয়েক দিন পর, মাঝরাতের দিকে স্ত্রীর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। অন্ধকারে হাতড়ে দেখলো, পাশে বাচ্চাটা নেই। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। দূর থেকে বাচ্চাটার কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। স্বামীকে ডেকে তুলল।

–ওগো শুনছো! খোকাকে ঘরে দেখছি না। দূর থেকে খোকার কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। কান্নার আওয়াজটা বৃষ্টির কারণে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। স্বামী বললেন,

–তুমি গিয়ে নিয়ে আসো না।

–আপনিও সাথে চলুন। খোকা তো কেউ না নিয়ে গেলে একা একা বাইরে যেতে পারবে না। আমার কেমন যেন লাগছে।

–আচ্ছা চলো।

দু'জন বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে শুনে গিয়ে দেখলেন, বাচ্চাটা ঘরের পুবকোণে খড়ের গাদার কাছে মাটিয়ে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। বৃষ্টির পানি আর কাদায় পরনের কাপড় কালো হয়ে আছে। ছোট্ট বাচ্চাটা শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। ঠাণ্ডায় দু'ঠোঁট নীল হয়ে আছে।

মা পাগলিনীর মতো ছুটে গিয়ে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিলেন। বাচ্চা নিয়ে ফিরে আসার সময়, অর্ধেক পথ আসার পর এক দমকা বাতাসে তাদের ছোট্ট ঘরটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো।

দু'জনে কোনরকমে রাতটুকু কাটিয়ে দিলো। পরদিন ভোরে ঘরের জিনিসপত্র বের করতে গিয়ে মানুষজন দেখলো, ভাঙা ঘরের ভেতরে রমিজ মিয়ার নিথর লাশ পড়ে আছে। তার হাতে একটা টাকার থলে শক্ত করে ধরা।

জীবন জাগার গল্প : ৪০১

পিতা ও পুত্রী

(ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকা এক পিতা ও কিছুদিন আগে মারা যাওয়া মেয়ের কথোপকথন)

বাবা: মা রে! তুই কেমন আছিস?

মেয়ে: আমি কেমন আছি সেটা দিয়ে তুমি কী করবে? আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই উত্তম অভিভাবক।

বাবা: মা, তুই দেখি রেগে আছিস।

মেয়ে: রেগে থাকবো না তো কি হেসে বেড়াবো?

বাবা: তোর চেহারা-সুরতের এই দশা কেন? আর তুই আমার দিকে এমন হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছিস যে?

মেয়ে: আমার ভেতরে রাগের পাহাড় জমে আছে। কিছু মানুষকে হাতের কাছে পেলে হাড় চিবিয়ে খেয়ে ফেলতাম। তাহলে এখানে যাক্কুম খাওয়ার জ্বালা কিছুটা হলেও মিটতো।

বাবা: তোকে কি যাক্কুম খেতে দিচ্ছে ওখানে?

মেয়ে: কেন তুমি কি আমার জন্য এখানে শারাবান তাহুরার ব্যবস্থা করে রেখেছিলে নাকি?

বাবা: আমি তো সাধ্যানুযায়ী তোকে লালনপালনের ব্যবস্থা করেছি।

মেয়ে: এই বাবা! বাজে কথা বলবে না। তুমি আমার কী লালন-পালনের ব্যবস্থা করেছ? তোমার কারণেই আজ আমার এই হাল।

বাবা: আমি আবার কী করলাম। আমি তো তোর যখন যা লাগে, এনে দিয়েছি। তোর কোনও কাজে বাধা দেইনি। তোর জন্য সব করেছি।

মেয়ে: আরে সেটাই তো আমাকে আজ ডুবিয়েছে। তুমি যেটাকে সব বলছ, সেটাই সব নয়। তুমি আমার জন্য অনেক কিছুই করোনি। তুমি আমাকে ফজরের নামাযের সময় ডেকে দাওনি। আমাকে একা একা মার্কেটে যেতে বাধা দাওনি। টিভি-কম্পিউটারে খারাপ ছবি দেখতে বাধা দাওনি। আমার স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হয়ে যেতে দেখেও তুমি কিছুই বলোনি। আমি রাত জেগে কম্পিউটার-ইন্টারনেটে কী করতাম তার খোঁজখবর করোনি। আমি সারাক্ষণ রুমে উচ্চগ্রামে মিউজিক বাজাতাম, তুমি একটি বারের জন্যও বাধা দাওনি। পাড়ার দোকান থেকে সিডি-ডিভিডি কিনে আনতে গেলে, তারা অশ্লীল কথা বলতো জেনেও তুমি কিছু বলোনি। আমরা টিভি সিরিয়াল দেখে ঘরেও সেসবের আলোচনা করলে তুমি বাধা দাওনি।

এরপরও তুমি বলবে, তুমি আমার জন্য সবকিছু করেছো? দাঁড়াও! তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে না ফেলতে পারলে আমার স্বস্তি হবে না।

(মেয়ে বাবাকে ধরার জন্য দৌড়ে এলো)

বাবা বিকট চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে হাঁপাতে লাগলো।

জীবন জাগার গল্প : ৪০২

ব্যবসার কৌশল

একজন ব্যবসায়ী মরুভূমির পথ ধরে দূরের এক শহরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে পানি ফুরিয়ে গেলো। আশেপাশে কোথাও পানি পাওয়া গেলো না। অনেকদূর পথ চলার পর একজন বেদুঈন এসে ব্যবসায়ীর সাথে যোগ দিলো। সেও সামনের দিকে যাবে। ব্যবসায়ী দেখলো বেদুঈনের কাছে বিরাট একটা মশক পানি আছে।

—আমাকে সামান্য পানি দিতে পারো? বড়ই তেষ্টা পেয়েছে।

—এমনি এমনি তো পানি দিতে পারবো না। তুমি চাইলে বিক্রি করতে পারি।

ব্যবসায়ী চড়ামূল্যে পানির মশক কিনে নিলো। কিছুদূর পথ হাঁটার পর ব্যবসায়ী বললো,

–তোমার কি খিদে পেয়েছে?

–জি পেয়েছে।

–এই নাও ছাতু। এগুলো খাও।

বেদুইন ছাতু খেলো। শুকনো ছাতু খেয়ে তার পানির পিপাসা হলো। সঙ্গীর কাছে পানি চাইলো। ব্যবসায়ী বললো,

–এমনি এমনি তো পানি দেয়া যাবে না। তুমি একবারে যত ইচ্ছা পান করতে পারো। তবে তার বিনিময়ে আমাকে একশ দীনার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

ব্যবসায়ী নিজের দীনারগুলোও ফেরত পেলো। পানির মশকটাও নিজের আয়ত্তে রেখে দিলো। এভাবেই মরুভূমিতেও নিজের ব্যবসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিলো।

জীবন জাগার গল্প : ৪০৩

হাতুড়ির বাড়ি

অনেক বড় একটা জাহাজের ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে। এজন্য জাহাজটা একটা দ্বীপে আটকা পড়ে আছে।। জাহাজে থাকা ক্রু-ইঞ্জিনিয়ার সবাই মিলে চেষ্টা করলো, ঠিক করা গেল না। শেষে হাল ছেড়ে দিল। জাহাজ নোঙ্গর ফেলে অপেক্ষা করতে থাকল।

মূল অফিসে যোগাযোগ করা হল। মালিকপক্ষ আলাদা বোটে করে একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে দিল। ইঞ্জিনিয়ার এসেই কাজে লেগে গেল। খুবই যত্নের সাথে ইঞ্জিনটা আগাগোড়া পরীক্ষা করে দেখলো।

জাহাজের প্রধান কর্মকর্তাও সাথে থেকে ইঞ্জিন মেরামতের কাজ তদারক করছে। বুড়ো ইঞ্জিনিয়ার তার পর্যবেক্ষণ শেষ করে সাথে আনা ব্যাগ থেকে একটা হাতুড়ি বের করলো। ইঞ্জিনের একটা জায়গায় হালকা একটা বাড়ি দিলেন আর একটা বল্টু একটু ঘুরিয়ে দিলেন। সাথে সাথেই ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল। সবাই অবাক।

এক সপ্তাহ পরে অফিসে বিল এল। জাহাজের প্রধান কর্মকর্তা টাকার অংক দেখে অবাক।

= দশ হাজার টাকা!

আশ্চর্য তো, বুড়োটা তো বলতে গেলে কিছুই করেনি। শুধু একটা হাতুড়ি দিয়ে আলতো একটা বাড়ি দিয়েছে। ব্যস! একটা বাড়ি দিয়েই দশ হাজার টাকা? মগের মুল্লুক পেয়েছে নাকি!

কর্মকর্তা বিলের কাগজটা ফেরত পাঠালেন। এক কোণে লিখে দিলেন,

-বিস্তারিত হিশেব দিন।

কয়েকদিন পর ফিরতি বিল এল:

এক: হাতুড়ির বাড়ির মূল্য ১/- (এক টাকা)।

দুই: কোথায় বাড়ি দিতে হবে সে তথ্যের মূল্য ৯৯৯৯/-।

❖ জীবনে প্রচেষ্টা-সাধনা করে যাওয়া যতটা না জরুরি, তারচেয়েও জরুরি হলো, কিভাবে কোথায় চেষ্টাটা করতে হবে, সেটা জানা। এই জানাটাই জীবনকে ভিন্নমাত্রা দান করে।

❖ চট করে সিদ্ধান্ত নিলে এক মিনিটেই জীবন বদলে যাবে না। এক মিনিট চিন্তা করে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিলেই বরং জীবন বদলের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

জীবন জাগার গল্প : ৪০৪

সুন্দর মন

স্বামী আক্ষেপ করে বললো,

—আমার আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা দেখেছ, আমার ব্যবসা যখন ভাল থাকে, তারা গ্রাম থেকে, দূর-দূরান্ত থেকে দলে দলে এসে বাসায় ওঠে। গ্রাম থেকে এটা-সেটা নিয়ে আসে। কলাটা-মুলোটা এনে ঘর ভর্তি করে ফেলে।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।

—কিন্তু এখন আমার ব্যবসাটা একটু মন্দা যাচ্ছে, টাকা-পয়সার টানাটানি চলছে, কেউ এদিকে আসা তো দূরের কথা, একটু ফোন করেও খোঁজ নিচ্ছে না। সব নিমক হারামের দল।

—এভাবে ভাবছেন কেন? আমার তো মনে হয়, তারা আমাদের অবস্থার কথা বিবেচনা করেই আসছেন না। তাদের যথাযথ সমাদর করতে না পারলে, আপনি লজ্জা পাবেন বলেই তারা আসছেন না। একই কারণে যোগাযোগও করছেন না।

—বউ! সুন্দর বলেছ তো! এভাবে তো ভাবিনি!

জীবন জাগার গল্প : ৪০৫

কাশ্মীরি হাজি

খানায়ে কাবার গিলাফ ধরে, এক মহিলা আকুলভাবে কেঁদে যাচ্ছে। কেঁদেই যাচ্ছে। এক দম্পতি দূর থেকে দৃশ্যটা খেয়াল করলো। অনেকক্ষণ কাঁদার পর, মহিলাটা জড়োসড়ো হয়ে মাকামে ইবরাহীমের কাছে ।সে বসল।

দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, মহিলা কোনও বিপদে পড়েছে। হয়তো সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেছে। বাড়ি যাওয়ার মতো পাথেয় নেই। উপায়-উপকরণ নেই।

স্ত্রীকে খোঁজ নিতে পাঠিয়ে, স্বামী দূরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। স্ত্রী গিয়ে মহিলার পাশে বসে, কোমলভাবে জিজ্ঞেস করলো,

–আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন? আপনার কি কোনও সমস্যা হয়েছে?

–না তো, কেন? আমি কাশ্মীর থেকে এসেছি।

–আপনাকে আমরা অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছি। আপনি যেভাবে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছিলেন, আমরা ভাবলাম, কোনও বিপদ হলো কিনা?

–এই ঘরের কাছে বসে কাঁদতে তো বিপদে পড়তে হয় না।

–তারপরও এভাবে তো কাউকে কাঁদতে দেখিনি, তাই।

–তা অবশ্য ঠিক বলেছেন। আমার কাঁদার একটা উপলক্ষ আছে।

–কি কি সেটা?

–যাতে আগামী বছরও এই ঘরের কাছে আসতে পারি, সেটারই পাকাপাকি ব্যবস্থা করে নিচ্ছিলাম।

–আপনি তাহলে কয়বার হজ্জ করেছেন?

– তা এবার সহ উনিশবার হবে।

–উ নি শ বা র!। আপনি তো তাহলে অনেক বড় লোক!

–না বোন, আমি মোটেও বড়লোক নই। আমার স্বামীও নেই। মেয়ের জামাইকে সাথে নিয়ে আসি।

–টাকার ব্যবস্থা?

–বহেন জি! ইহাঁ আনে-কে লিয়ে পয়সে কি জরুরত নেহি। জরুরত হ্যায় "দিল কা ধড়কন আওর আঁখ কা আঁসূ"
(এখানে আসতে পয়সার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হৃদয়ের তড়পানি আর চোখের পানি)

জীবন জাগার গল্প : ৪০৬

টাকা ছাড়া হজ্জ

ঢাকার মুহাম্মাদপুর এলাকার এক আল্লাহর বান্দা। ছেলেবেলা থেকেই হজ্জ করার বিপুল আগ্রহ। বয়েস যতই বাড়ছে, খানায়ে কাবার প্রতি ইশক-মহব্বতও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এলাকাবাসী আর আত্মীয়স্বজনদের কাছে বিদায় নিতে গেলে তারা তো হেসেই খুন। কালু তুই কিভাবে হজ্জ করবি রে? দুই বেলার আহার জোটাতেই তোর নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা! এসব ছেড়ে কাজেকর্মে মন দে!

তাই তো, টাকা-পয়সা তো নেই! হজ্জে যাবে কিভাবে? তবুও মন কি মানে! যা সম্বল ছিল সেটা নিয়েই রওনা হয়ে গেল। করাচি পর্যন্ত পৌছতেই পকেট খালি হয়ে গেল।

কালু মিঞা মন খারাপ করে বন্দরের পাশের এক মসজিদে শিশুহারা মায়ের মতো কাঁদতে শুরু করলো।

–ইয়া রাব্বাল কা'বা! আমাকে আপনার ঘরে নিয়ে যান। আমাকে আপনার ঘরে নিয়ে যান!

জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। কালু মিঞা ভগ্নহৃদয়ে জাহাজঘাটায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু পরেই নোঙ্গর তুলে ফেলা হবে। বায়তুল্লাহর মুসাফিরগণ জাহাজের রেলিং ধরে আত্মীয়-স্বজনদেরকে শেষবারের মতো বিদায় জানাচ্ছে। কালু মিঞা ডুকরে কেঁদে উঠলো! হজে বুঝি যাওয়া হল না।

কালু মিঞা দেখল জাহাজের রেলিংয়ে শাদা পোশাক পরা একজন অফিসার এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে একটা মাইক। অফিসার ঘোষণা দিলেন,

–জেটিতে দাঁড়ানো লোকদের উদ্দেশ্যে বলছি। আপনাদের মধ্যে কেউ কি আছেন, একটি নবাব পরিবারের সেবক হিশেবে হজ্জে যেতে পারবেন! তাকে সম্মানজনক ভাতা দেয়া হবে।

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কালু মিঞা পড়িমরি ছুটলেন। চিৎকার করে বলছেন,

–ম্যায় হুঁ, ম্যায় হুঁ! আমি আছি! আমি আছি!

জীবন জাগার গল্প : ৪০৭

নাড়ীর টান

–হ্যালো, আম্মু!

–ওমা! বিলু তুই? এ্যাদ্দিন পর মাকে মনে পড়লো বুঝি?

–কি করবো বলো, সারাদিন এত এত ব্যস্ততা! তুমি কেমন আছ আম্মু?

–আমি ভাল আছি রে খোকা! তুই কেমন আছিস সেটা আগে বল। আমার কলিজার টুকরা দুটো কেমন আছে? নিয়মিত স্কুলে যায় তো? বৌমা কেমন আছে?

–সবাই ভাল আছে।

–এবার বল, তোর মন খারাপ কেন? দুজনে ঝগড়া হয়েছে? বা অফিসে কোনও সমস্যা?

–আম্মু তুমি কিভাবে বুঝলে?

–আমি কি আর না বুঝে থাকতে পারি রে! তোদের তো মন খারাপ হলেই শুধু মাকে মনে পড়ে!

জীবন জাগার গল্প : ৪০৮

দায়িত্বের চাপ

বলশেভিক বিপ্লবের পরবর্তী ঘটনা। লালফৌজের নৃশংস নির্যাতনে মানুষ দেশ-ভিটেমাটি ফেলে আত্মরক্ষার্থে পালাচ্ছে। তাজিকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে। একদল লোক রাতের আঁধারে, সোভিয়েত সৈন্যদের কড়া পাহারা গলে, দেশত্যাগ করছিল।

.

সীমান্তের দুর্গম গিরি পার হওয়ার সময় দলনেতা দেখল, রাস্তার সামনের দিকে দুইজন মানুষ জবুথবু হয়ে বসে আছে। বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা। বুড়ির কোলে একটা ছোট্ট শিশুও আছে।

কাছে যাওয়ার পর, বুড়ি দলনেতার কাছে করুন আবেদন জানালো,

–আফেন্দী! এই বুড়োবুড়িকে একটু দয়া করুন। আমাদেরকেও আপনার দলে ভেড়ার অনুমতি দিন।

দলনেতা অন্যদের সাথে পরামর্শ করে বললো,

–আমরা অনুমতি দিতে পারি এক শর্তে, আপনার নিজ দায়িত্বে পথ চলবেন। আমরা কোনও সাহায্য করতে পারব না। শুধু এটুকু করতে পারবো, বাচ্চাটাকে আমরা পালাক্রমে বহন করব।

.

কাফেলা আবার চলতে শুরু করলো। সীমান্তের একদম কাছাকাছি আসার পর, বুড়ি কষ্টেসৃষ্টে পথ চলতে পারলেও বুড়োটা ক্লান্তিতে রাস্তার ওপরই শুয়ে পড়ল। বিড়বিড় করে বলল,

–আমার পক্ষে আর এক কদমও হাঁটা সম্ভব নয়।

দলনেতা বিচলিত হয়ে পড়লো। অনেক ভেবে দলের অন্যদের দিকে তাকিয়ে, নির্মম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো। বুড়োকে ফেলে রেখেই কাফেলা এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

কিন্তু কয়েকজন জোর আপত্তি জানালো। এভাবে একজন অসহায় বৃদ্ধকে কিভাবে রেখে যাবে? কিন্তু উপায় কি? বাড়তি কোনও বাহন নেই। বৃদ্ধকে কাঁধে নিয়ে হাঁটাও সম্ভব নয়।

.

এই অচলাবস্থা দেখে বৃদ্ধা এগিয়ে এল। এক মহিলার কোল থেকে নাতনিটাকে নিজের কোলে নিয়ে নিল। দলনেতাকে বলল,

–আপনি কাফেলাকে পথচলা শুরু করতে বলুন।

.

বৃদ্ধা নাতনিকে নিয়ে বুড়োর পাশে রেখে এসে, কাফেলার সাথে হাঁটা শুরু করলেন।

.

বৃদ্ধ তার পাশে ছোট্ট নাতনিকে কাঁদতে দেখে, বিচলিত হয়ে পড়ল। কোনরকমে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসল। দাঁতমুখ খিঁচে, নাতনিকে কাঁধে চড়িয়ে পা ঘষটে ঘষটে হাঁটতে শুরু করলো।

জীবন জাগার গল্প : ৪০৯

মা শুধু মাই

ছেলে স্কুল থেকে ভিজে ভিজে বাসায় ফিরল। দরজা খুলেই সবাই তাকে ছেঁকে ধরলো।

ভাইয়া: কি রে, ছাতা নিয়ে যেতে পারলি না?

আপু: জানি জানি, তোর তো বৃষ্টিতে ভিজতে ভালো লাগে। জ্বর এলে আমাকে জ্বালাতন না করলেই হয়।

আব্বু: এই! বৃষ্টি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে না কেন? এখন অসুখ বাঁধালে ডাক্তার-বদ্যি করবে কে?

.

আম্মু নীরবে এসে তোয়ালে দিয়ে শরীর-মাথা মুছে দিতে দিতে বললেন,

–বৃষ্টিটা বুঝি আরেকটু পরে আসতে পারলো না! ইশ! আমার মাণিকটাকে একদম ভিজিয়ে দিল!

জীবন জাগার গল্প : ৪১০

সুন্দরী বউ

হুযুরের কাছে এক লোক এল। অনেক সংকোচ-দ্বিধার পর সমস্যা খুলে বললো,

–হুযুর! আমি বিয়ের আগে, প্রথমবার যখন আমার স্ত্রীকে দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীতে তার মতো সুন্দরী মেয়ে আর সৃষ্টি করেননি।

যখন তাদের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে সব ঠিকঠাক করা হলো, তখন রাস্তায় বের হলেই আরও অনেক মেয়েকেই তার মতো সুন্দরী মনে হতো।

.

যখন বিয়ে হয়ে গেল, মনে হতে লাগল, জীবনে বিরাট ভুল করে ফেলেছি। দুনিয়ার সমস্ত মেয়েই আমার বউয়ের চেয়ে সুন্দর। আরও দেখেশুনে বিয়ে করা উচিত ছিল। আফসোসের সীমা রইল না।

হুযুর বললেন:

–যদি তুমি জগতের সমস্ত মেয়েকেও বিয়ে করে ফেলতে, তোমার কাছে বিয়ে করা স্ত্রীদের চেয়ে, রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো বেওয়ারিশ কুকুরগুলোকেই সুন্দরী মনে হতো।

–এটা কেমন কথা বললেন, হুযুর?

-কারণ সমস্যা তোমার স্ত্রীর মধ্যে নয়, সমস্যা তোমার মধ্যে।

তোমার মধ্যে একটা লোভী হৃদয় আছে। দুনিয়ার সমস্ত বাড়ি-গাড়ি-নারী পেলেও সেটা তৃপ্ত হবে না।

তোমার মধ্যে একটা কুতকুতে চোখ আছে, কবরের মাটি ছাড়া আর কিছু সেটাকে ভর্তি করতে পারবে না।

তুমি কি তোমার স্ত্রীকে সেই আগের মতো সুন্দরী দেখতে চাও?

–জি হুযুর, চাই। একশবার চাই। এজন্য যত টাকা লাগে খরচ করতে রাজি আছি। কোন বিউটি পার্লারে নিয়ে যেতে হবে ঠিকানাটা বলুন শুধু!

–ওরে নাদান! এসবের কিছুই করতে হবে না।

–তাহলে?

–শুধু নিজের দৃষ্টিটা সংযত করলেই হবে। বেগানা নারীর দিকে না তাকালেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

জীবন জাগার গল্প : ৪১১

বদনযর

একটু পরেই বরযাত্রীরা এসে পড়বে। কনে সাজানোর সব কাজ প্রায় শেষ। কনের মা একটু আগে এসে মেয়েকে দেখে গেছেন। বারবার দেখে যাচ্ছেন, তবুও আশ মিটছে না। গর্বে বুক ফুলে উঠছে। এমন একটা সুন্দর মেয়েও তার আছে?

হঠাৎ হাঁকডাক বেড়ে গেল। বরযাত্রী এসে গেছে। মা ওপরতলায় এলেন, মেয়েকে নিচে নামিয়ে নিতে। মেয়ে ব্যাকুল হয়ে মাকে কাছে ডেকে বলল,

–আম্মু একটু আমার কাছে এসে বসো। আমার কেমন যেন লাগছে।

–কেন কী হয়েছে মা?

–কেন যেন আমি আশেপাশের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

–ঘাবড়াবার কিছু নেই, ঠিক হয়ে যাবে। বিয়ের দিনের উত্তেজনা-দুশ্চিন্তায় সাময়িক এসব দেখা দেয়। চল, নিচে যাই। ওখানে সবাই বসে আছে।

–না আম্মু, ব্যাপারটা তেমন নয় মোটেও। অনেকক্ষণ ধরেই এমনটা হয়েছে।

.

মা থমকে গেলেন। একজন বয়স্কা মহিলা বললেন,

–আমরা যারা এতক্ষণ এই ঘরে ছিলাম, সবাই ওযু করে আসি। আমার মনে হচ্ছে, তার ওপর কারো বদনযর পড়েছে। আমরা তার জন্যে ইস্তেগফার পড়ে দু'আ করবো। তাতে আশা করি ঠিক তার দৃষ্টি ঠিক হয়ে যাবে।

মা ছাড়া বাকি সবাই ওযু করে এল। দু'আ করলো। কিন্তু কোনও সমাধান হলো না। খবরটা ভেতরবাড়ি ছাড়িয়ে বাহিরবাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। পাত্রপক্ষ এমতাবস্থায় বিয়েতে বেঁকে বসলো। তাদের মুরুব্বিরা বিয়েটা স্থগিত করে দিতে বলল। এমন সময় পাত্র শক্ত অবস্থান নিয়ে বললো,

–বিয়ে এখানে হবেই। একটা মেয়েকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে যেতে চাই না। আমরা তো আগেই পাত্রী দেখে দিয়েছি। তখন তো ভালো ছিল। আর এই সমস্যা তো বিয়ের পরেও হতে পারতো, তখন?

.

বিয়ে হয়ে গেল। স্বামী অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাল। কিছুতেই কিছু হলো না। কোনও রোগ ধরা পড়ল না। স্বামী খোঁজ করতে করতে এক বৃদ্ধ আলিমের সন্ধান পেল। স্ত্রীকে নিয়ে তার কাছে গেল। জ্ঞানবৃদ্ধ আলিম বললেন,

–আমার যতদূর মনে হয়, তোমার স্ত্রী বদনযরের শিকার হয়েছে। নযরটা এত বেশি গভীর যে, যার দৃষ্টি পড়েছে, সে মারা যাওয়া ছাড়া এই রোগ সারার নয়।

এভাবেই চলছিল দিন। একদিন সকালে স্ত্রী ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে গেল। আশেপাশের দৃশ্যটা এখন আর আগের মতো অন্ধকার লাগছে না। চারপাশের সবকিছুকে দৃশ্যমান লাগছে। তাড়াতাড়ি ফোনের কাছে গেল। বাড়ির নাম্বারে ডায়াল করলো। রিসিভার ওঠাল বড় ভাই:

–আমিই তোকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।

–এই সাত সকালে আমাকে ফোন কেন? আম্মু কোথায়? তার সাথে কথা বলতে চাই। তাকে একটা খুশির খবর দিতে চাই!

–কি খবর?

–আম্মুকেই সবার আগে খবরটা দিবো।

–শোন, মন খারাপ করিস না। আম্মু আজ ফজরের নামাযের পর, ইন্তেকাল করেছেন!

মেয়ের হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়লো। এক সাথে নানা বিপরীতমুখী অনুভূতি ও চিন্তা মাথায় এসে ভর করলো। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে একটা কথা মনে এল। বৃদ্ধ হুযুর বলেছিলেন,

–অনেক সময় অতি আপনজন থেকেও বদনযর লাগতে পারে। অতি মুগ্ধতা থেকেই মাঝে মধ্যে নযর লেগে যায়।

আরও মনে পড়লো, সবাই ওযু করতে গেলেও আম্মু সেদিন ওযু করতে যাননি।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

–তোমাদের কারো যদি নিজের প্রতি, সম্পদের প্রতি, আপন ভাইয়ের প্রতি মুগ্ধতা জাগে, তাহলে বরকতের জন্যে দু'আ করো। কেননা চোখের দৃষ্টি (বদনযর) সত্য।

জীবন জাগার গল্প : ৪১২

নষ্টের গোড়া

তুমুল বিতর্ক চলছে। নারী ও পুরুষ নিয়ে।

–আমি অনেক ভেবে দেখেছি, সব দেখেশুনে আমার একটা কথা মনে হয়েছে।

–কী কথা?

–আমার মনে হয়েছে, নারীরাই সব নষ্টের মূল। তারাই সব ক্ষতির গোড়া!

–হ্যাঁ, সেটা তো তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

–আমাকে দেখে কিভাবে?

–একজন বিদূষী নারী, নয় মাস অকল্পনীয় কষ্ট করে, তোমার মতো একজন অকৃতজ্ঞ, আহমক আর নারী বিদ্বেষীকে জন্ম দিয়েছেন। অবশ্যই এটা মোটেও ভাল করেননি।

জীবন জাগার গল্প : ৪১৩

বাবার হজ্জ

বয়েস হয়ে গেছে। তবে এখনো বেশ বেশ শক্ত-সমর্থ আছে। হাঁটাচলা থেকে শুরু করে ভারী কাজ এখনো করতে পারেন। তবুও মাঝে মধ্যে মনে হয়, ক'দিন পর আর রথ-হাত চলবে না।

সেজন্য ঠিক করলেন শরীর ভেঙে আসার আগেই হজ্জটা সেরে ফেলবেন। কিন্তু বিবি-বাচ্চার চিন্তায় এতদিন কথাটা পাড়তে পারেননি। মেয়েটা সবার বড়। ছেলেগুলোও বড় হয়ে উঠেছে। তারপরও পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব এখনো তার কাঁধেই।

রাতের খাবারের পর সবাইকে নিজের ইচ্ছের কথা খুলে বললেন। বিবি আর ছেলেরা হায় হায় করে উঠলো।

–আমাদেরকে কী হবে?

বাবা দেখলেন মেয়েটা চুপচাপ আছে। কিছু বলছে না।

–মা! তুই কিছু বললি না যে?

–কী আর বলবো! আপনি আল্লাহর ঘরে যাবেন, আল্লাহই আমাদেরকে দেখবেন। আপনি নিশ্চিন্ত মনে চলে যান। মক্কা-মদীনা ঘুরে আসুন। আমাদের জন্যে কোনও চিন্তা করবেন না।

•

বাবা হজ্জে চলে গেলেন। প্রথম কিছুদিন সংসারের চাকা ঠিকঠাক চললো। আস্তে আস্তে সঞ্চয় ফুরিয়ে আসতে লাগলো। মা অসুস্থ থাকায় মেয়ে সেলাই করে ভাতপানির ব্যবস্থা করে যেতে লাগলো। তবুও টানাটানি অবস্থা সহ্য করতে না পেরে ভাইয়েরা বললো,

–আপু, তোর কারণেই আমাদের আজ প্রায় না খেয়ে থাকতে হচ্ছে। তুই কেন আব্বুকে হজ্জে যেতে দিলি?

বোন কিছু না বলে চুপচাপ তাদের কথা শুনে গেল। আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকলো।

দেশের রাজা শিকার থেকে ফেরার সময়, দলবল নিয়ে সেই গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজার পানির পিপাসা হলো। পানি আনতে পাঠালেন।

পাইক-পেয়াদা ছুটলো। রাজা পানি খেয়ে খুবই তৃপ্ত হলেন। খোঁজ করে জানতে পারলেন, বাড়ির লোকেরা পানির সাথে সামান্য চিনিও মিশিয়ে দিয়েছিল। মুগ্ধ রাজা পুরস্কার দিলেন। অন্যদেরকেও বললেন,

–তোমরাও পারলে কিছু কিছু দাও।

.

রাজদান পেয়ে মা ও ভাইয়েরা বেজায় খুশি। কিন্তু বোনের মুখে হাসি নেই। বেজার হয়ে ঘরের এক কোণে বসে আছে।

–কিরে আপু! তুই এই খুশির দিনে মন খারাপ করে বসে আছিস কেন?

–একজন বান্দা আমাদের প্রতি সামান্য খুশি হয়েছে, তাতেই আমরা একদিনে বড়লোক হয়ে গেছি। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি খুশি হন তাহলে কেমন হবে?

জীবন জাগার গল্প : ৪১৪

রাজার খাহেশ!

রাজ্যের নানা সমস্যার পর্বতপ্রমাণ চাপে রাজা পর্যুদস্ত। কোমর-মেরুদণ্ড ভেঙে নুয়ে পড়ছেন। উযিরকে ডেকে পাঠালেন।

–জো হুকুম জাহাঁপনা!

–আমার রাজ-অঙ্গুরির ওপর এমন একটা বাক্য খোদাই করে নিয়ে এসো, যে বাক্য দুঃখের সময় পড়লে মনে আশা জাগবে, সুখের সময় পড়লে নিরাশা জাগবে।

.

উযির পড়লেন বিপাকে। এমন কী বাক্য আছে, যেটা লিখলে গর্দানও বাঁচবে, রাজাও খোশ হবেন। অনেক ভেবেচিন্তে, রাজ্যের তিনমাথাঅলা বুড়োদের সাথে শলাপরামর্শ করে, একটা বাক্য খোদাই করে আনলেন।

= 'এই সময় অচিরেই চলে যাবে'।

জীবন জাগার গল্প : ৪১৫

খাদে পড়া আলেম

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন একজন আলেম। তিনি দেখলেন, এক লোক গর্ত খুঁড়ছে। গর্তটা অনেক গভীর হয়ে গেছে। লোকটা যে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কোদাল চালাচ্ছে, একটু এদিক সেদিক হলেই গর্তে পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

–এই যে! তুমি সাবধানে দাঁড়াও! গর্তে পড়ে যাবে তো!

লোকটা আলেমের কথা শুনে বললো,

–আমার চেয়ে বরং আপনিই বেশি সতর্ক থাকুন। আমি গর্তে পড়লে একাই পড়বো। আপনি গর্তে পড়ে গেলে পুরো বিশ্বটাই আপনার সাথে গর্তে পড়ে যাবে।

.

(কারো কারো গল্পটা ইমাম আযমকে (রহ.) নিয়ে)

জীবন জাগার গল্প : ৪১৬

চোখের পানির ওজন

আবু নসর একজন জেলে। মাছ ধরাই তার পেশা। মাছ বিক্রি করেই তার পরিবার চলে।

আহমাদ বিন মিসকীন। শহরের বড় আলেম। সবার শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর কাছে একদিন আবু নসর এসে বলল,

–শায়খ! নদীতে অনেকক্ষণ জাল ফেলেও কোনও মাছের দেখা পাইনি। ঘরে বিবি আর একমাত্র বাচ্চাটা ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে কাঁদছে। এই অবস্থায় কোনও খাবার না নিয়ে কোন মুখে ঘরে ফিরি?

–ঠিক আছে, চলো নদীতে যাই।

শায়খ আবু নসরকে নিয়ে নদীর তীরে গেলেন।

–চলো প্রথমে দুই রাকাত নামায পড়ে নিই।

দু'জনে নামায পড়লো।

–এবার বিসমিল্লাহ বলে জাল ফেলো।

জালে বিরাট এক মাছ উঠলো। আবু নসর বাজারে মাছটা বিক্রি করে, ঘরের জন্যে খাবার কিনলো। বাড়ি ফেরার পথে, শায়খের দরবারে গিয়ে কিছু খাবার হাদিয়া হিশেবে দিতে চাইল। হুযুর বললেন,

–আমি যদি এভাবে নিজেকে খাওয়াতাম, তাহলে আজ তোমার জালে মাছ উঠতো না। সব খাবার ঘরে নিয়ে যাও। বিবি-বাচ্চাকে খাওয়াও।

আবু নসর খাবার নিয়ে বাড়ি ফিরছিলো। পথে দেখল একজন মহিলা বসে বসে কাঁদছে। কোলের মেয়েটাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়, মা-মেয়ে তার হাতের রুটির দিকে বুভুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। আবু নসর এগিয়ে যেতে নিয়েও ফিরে এলো।

–তোমরা কাঁদছো কেন গো!

–ক্ষুধায়। আজ দু'দিন যাবৎ কিছুই খেতে পাইনি। মেয়েটার কষ্ট দেখে আমারও আর সহ্য হচ্ছিলো না।

আবু নসর দেখল, এদের অবস্থা ঠিক তার বউ-বাচ্চার মতই। তারাও ঘরে বসে বসে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে। আগপিছ কিছু না ভেবেই হুট করে বললো,

–আর কেঁদো না। এই নাও, রুটি দু'টো খেয়ে নাও।

রুটি দিয়ে বাড়ির কাছাকাছি আসার পর মনে হলো, এখন খালি হাতে বাড়ি গিয়ে কী হবে? বরং কষ্ট আরও বাড়বে। তার চেয়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করি। দেখি কোনও ব্যবস্থা করা যায় কি না।

আবু নসর একটা গাছের তলায় বসে বসে ঝিমুতে লাগলো। তার শরীরও ক্লান্তিতে নুয়ে আসছিলো। হঠাৎ তার নাম ধরে কে যেন ডাক দিলো।

–আবু নসর কে, আবু নসর?

আশেপাশের কয়েকজন লোক আবু নসরকে দেখিয়ে দিল। একজন দামী পোশাক পরা ব্যবসায়ী আবু নসরের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামলো।

–তুমি অমুক জেলের ছেলে আবু নসর?

–জি।

–আমি বিশ বছর আগে, তোমার আব্বার কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা করয নিয়েছিলাম। সময়মত ফেরত দিতে পারিনি। লোক মারফত খোঁজ নিয়েছিলাম। সংবাদ পেয়েছিলাম, আবু নসর মারা গেছে। তার কোনও

ছেলেসন্তান নেই। ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কিভাবে তোমার বাবার ঋণ শোধ করা যায়?

গত সপ্তাহে আমি ব্যবসার কাজে, অনেক দিন পর এই শহরে এসেছি। এবার আমি নিজে স্বয়ং খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম তোমার কথা। এই নাও ত্রিশ হাজার দীনার। তোমার বাবার টাকা দিয়ে আমি ব্যবসা করেছিলাম। সেটার লাভ সহ তোমাকে দিলাম। তুমি আমাকে ঋণমুক্ত করো।

.

আবু নসর এরপর আস্তে আস্তে শহরের সেরা ধনীতে পরিণত হলো। তার কাজকারবার ফুলে ফেঁপে উঠলো। দু'হাত খুলে দান-খয়রাত করতে শুরু করলো। একবারেই মুঠো ভরে এক হাজার দিরহাম করে দান করতে লাগলো।

আবু নসর বললো,

-এভাবে দান করতে করতে একসময় আমার মধ্যে অহঙ্কার দেখা দিল। আমার চেয়ে এই শহরে বড় দাতা আর কে আছে? কেউ নেই।

এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম,

= আমি মারা গেছি। কেয়ামতের মাঠে দাঁড়িয়ে আছি। মীযানে সবার আমল মাপা হচ্ছে। আমার পালা এল। আমার নেক আমল বদ আমল পাল্লায় তোলা হলো। অবাক কাণ্ড! আমার বদ আমলের পাল্লা ভারী বেশি ঝুঁকে আছে। আমি হায় হায় করে উঠলাম।

-আমার এত এত দান-সদকা কোথায় গেল?

আমি একথা বলার পর, সেই দান-খয়রাতকেও পাল্লায় তোলা হলো। দেখলাম প্রতি হাজার দিরহামের সাথেই দেখলাম একটা করে সিল মারা। সিলে লেখা,

-রিয়া, অহংকার ও খ্যাতির মোহযুক্ত দান।

এত ভারী ভারী দিরহাম-দীনারকেও সেই সিলের কারণে, তুলার চেয়েও হালকা হয়ে যেতে দেখলাম ।

হতাশায় আমার মাথার চুল ছেঁড়ার মতো অবস্থা। দিশেহারা হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

-বাঁচার কি কোনও উপায় নেই?

-তোমার আর কোনও আমল আছে, মাপার মতো?

আমি চিন্তা করে বললাম,

-আছে আছে। দুইটা রুটি আছে।

রুটি দুটো নেকির পাল্লায় তোলা হলো। এবার দুই রুটির ওজনে নেকির পাল্লা অনেকটা নিচে নেমে এলো। নামতে নামতে পাল্লার উভয় পাশ সমান হয়ে গেলো।

ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। এবার? পাল্লাদার ফিরিশতা জানতে চাইলো,

–আর কোনও নেকি আছে? না হলে তোমাকে আ'রাফে পাঠিয়ে দেব।

আমি চিন্তায় ডুবে গেলাম। হঠাৎ চিৎকার করে বললাম,

–পেয়েছি পেয়েছি। সেই মা-মেয়ের চোখের পানি!

অবাক ব্যাপার! মা-মেয়ের অশ্রু পাল্লায় রাখতে রাখতেই পাল্লাটা সড়াৎ করে মাটিয়ে নেমে গেল। যেন বহুমণী পাথর পাল্লায় রাখা হয়েছে।

এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল। অজান্তেই আমার মুখ দিয়ে শায়খ আহমাদের কথাটা বেরিয়ে এল:

–আমি যদি এভাবে নিজেকে খাওয়াতাম, তাহলে আজ তোমার জালে মাছ উঠতো না।

জীবন জাগার গল্প : ৪১৭

সুন্নাতের অভ্যেস

হযরতওয়ালা ডাক্তার আবদুল হাই রহ. বলেছেন,

–আমি একবার সফরে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে পানির পিপাসা পেয়ে গেলো। একটা মসজিদে গেলাম। সামনে একটা পনির মটকা রাখা ছিল। সবার জন্যে উন্মুক্ত। আমি খোরায় করে পানি নিয়ে এক পাশে সরে গিয়ে, মাটিতে বসে পানি পান করলাম। একটা গ্রাম্য লোককে দেখলাম, আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পানি পান শেষ হলে, লোকটা কাছে এসে বললো,

–আপনি এত গুরুত্বের সাথে বসে পান করলেন কেন? এর কী প্রয়োজন ছিল? দাঁড়িয়ে পান করলেই পারতেন!

চিন্তা করলাম, এই সরল লোকটার সাথে বেশি কথা বলা ঠিক হবে না। বললাম,

–ভাইসাব! আমি বসে বসেই পানি পান করতে অভ্যস্ত। লোকটা আমাকে চমকে দিয়ে বললো,

-আরে মিয়াঁসাব! বসে পান করা সুন্নাত, এটা বললেই তো হয়! সুন্নাতটাই অভ্যেসে পরিণত হয়েছে, এটা তো বহুত কামাল কি বাত!

জীবন জাগার গল্প : ৪১৮

যাকাতের সুরক্ষা

সিরিয়ার একদল লোক হজ্জের নিয়ত করলো। দলের সবাই অর্থসম্পদের অধিকারী। তারা একজন খাদেম খুঁজছিল, পুরো সফরে তাদের কাজকর্ম-রান্নাবান্না করে দিবে। টুকটাক ফুটফরমাশ খাটবে। একজনকে পাওয়া গেল। তাকে বলা হলো,

–তোমাকে আমরা সম্মানজনক একটা ভাতা দিব। উপরি হিশেবে হজ্জও করতে পারবে।

–আমি রাজি। কতদিন ধরে এমন একটা সুযোগের জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করে আসছি। এবার তিনি আমার কথা শুনেছেন।

.

কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল। মক্কায় পৌঁছে একটা ঘর ভাড়া নিল। খাদেম মনপ্রাণ দিয়ে খেদমতে লেগে গেল। রান্নাবান্না-গোছগাছ করেই তার সময় কাটতে লাগল। ফাঁকে ফাঁকে সময় বের করে হজ্জের কাজও সারছে।

কয়েক পর রান্নাঘরে বসে পাটায় মশলা পিষছে, পুতার আঘাতে শুকনো হলুদ গুঁড়ো করছে। হঠাৎ তার মনে হলো, পাটার নিচের মাটি থেকে কেমন যেন আওয়াজ আসছে। পাটা সরিয়ে হাত দিয়ে আঘাত করে দেখল, যা ভেবেছিল তাই। এ জায়গাটা ফাঁপা। ভেতরে গর্ত আছে।

দা এনে মাটি খুঁড়লো। দেখা গেলো, ছোট্ট একটা লোহার বাক্স পোঁতা আছে। বাক্সটা খুলে দেখা গেল, ভেতরে একটা থলে রাখা। থলের মধ্যে অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা।

তাড়াতাড়ি থলেটা বাক্সে পুরে মাটি চাপা দিল। তাকে লোভে পেয়ে বসলো। স্বর্ণমুদ্রার হাতছানিতে সে হজ্জ করতে এসেছে একথা বেমালুম ভুলে গেল। এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বললো না।

.

হজের মৌসুম শেষ হয়ে এল। যাওয়ার আগের দিন থলেটা বের করে, নিজের সামানার মধ্যে গোপনে রেখে দিল। কাফেলা যাত্রা শুরু করলো। মাঝ পথে গিয়ে, এক রাতে কাফেলা বিশ্রামের জন্যে যাত্রাবিরতি করলো। খাওয়া-

দাওয়া সেরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। সকালে উঠে সবাই অবাক হয়ে গেল। কাফেলার একটা উটও নেই। সবগুলো হাওয়া!

অনেক খোঁজাখুঁজি করার অদূরে এক মরুদ্যানে উটগুলো পাওয়া গেল। শুধু খাদেমের উটটা পাওয়া গেল না। খাদেম হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল। দলের সবাই অবাক, একজন শক্তসমর্থ পুরুষ মানুষ একটা উটের জন্যে এভাবে কাঁদবে!

তারা সান্ত্বনা দিয়ে বললো,

–তুমি এভাবে কাঁদছো কেন, আমরা তোমাকে আরেকটা উট কিনে দেব।

–আরেকটা উট দিয়ে আমার কী হবে? এই উটের ওপর যে আমার জিনিসপত্র ছিল?

–ঠিক আছে, আমরা তোমাকে জিনিসপত্র কিনে দেব।

–ওখানে যে অমূল্য ধন ছিল সেটা আপনারা কোত্থেকে কিনে দিবেন?

খাদেম স্বর্ণমুদ্রার কথা খুলে বলতে পারছিলো না। লোকেরা অবাক হয়ে জানতে চাইলো,

–কী এমন অমূল্য ধন শুনি?

খাদেম এবার কথা ঘুরিয়ে উত্তর দিলো,

–ওখানে মক্কা-মদীনার বরকতপূর্ণ কিছু জিনিস ছিল।

.

কাফেলা সিরিয়া পৌঁছল। খাদেমকে যথাযোগ্য সম্মানী ও ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিদায় দেয়া হলো।

.

পরের বছর সিরিয়ার আরেকটা দল হজে যাওয়ার নিয়ত করলো। আগের বছর যারা হজ্জে গিয়েছিল তারা পরামর্শ দিল, তাদের খাদেমকে নিয়ে যেতে। তাই করা হলো।

.

কাফেলা পথ চলতে চলতে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। রাত হলে দলনেতা একটা মরুদ্যান দেখে যাত্রাবিরতির ঘোষণা দিল। খাদেম তার হাতের কাজ শেষ করে, চারপাশটা ঘুরে দেখতে বের হলো। জায়গাটা তার কাছে চেনা চেনা লাগছে। হাঁটতে হাঁটতে একটু দূরে গিয়ে দেখল একটা উটের কংকাল পড়ে আছে। পাশেই একটা ধুলোমলিন চামড়ার থলে পড়ে

আছে। খাদেম দৌড়ে গিয়ে থলেটা হাতে নিয়ে দেখলো তার ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র জীর্ণ হয়ে আছে। স্বর্ণমুদ্রাগুলোও আছে তাতে।

তাড়াতাড়ি দীনারগুলো লুকিয়ে রাখল। কাফেলা মক্কায় পৌঁছলো। দীনারগুলো আগের জায়গায় লুকিয়ে রাখলো। হজ্জের কাজ শুরু হয়ে গেছে। একদিন খাদেম বসে বসে রান্নাঘরে কাজ করছে, দরজায় টোকা পড়লো। খাদেম দরজা খুলে দেখলো, একজন অপরিচিত লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা বললো,

–আমি এই বাসার মালিক। এই ঘরে আমার একটা জিনিস রাখা আছে, সেটা নিতে এসেছি।

–ঠিক আছে, ভেতরে আসুন।

লোকটা ঘরে ঢুকে সোজা রান্নাঘরে চলে গেল। নির্দিষ্ট স্থানে মাটি খুঁড়ে স্বর্ণমুদ্রাগুলো বের করলো। খাদেম চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলো। আর থাকতে না পেরে বললো,

–আপনি কিভাবে জানতে পারলেন, এখানে স্বর্ণমুদ্রাগুলো রাখা আছে?

–আমি রেখেছি, আমি জানবো না?

–আপনি কি জানেন, এই দীনারগুলো সিরিয়ার কাছাকাছি মরুভূমিতে গিয়ে আবার এই জায়গায় ফিরে এসেছে?

–এই দীনার দুনিয়ার যেখানেই যাক, তাকে আবার এখানে ফিরে আসতেই হবে।

–এতটা নিশ্চিত কিভাবে হলেন?

–আমি নিয়মিত যাকাত আদায় করছি না!

জীবন জাগার গল্প : ৪১৯

বিবাহবিচ্ছেদ

আযীযা রফীক একজন পেশায় একজন ডাক্তার। গাইনি বিশেষজ্ঞ। স্বামী রফিক দাতু একজন হার্ট স্পেশালিস্ট। বেলজিয়ামের রাজপরিবারের চিকিৎসক। দীর্ঘদিন ধরে রাজা-রানি ও যুবরাজের চিকিৎসা করে আসছেন।

ডাক্তার দম্পতি বিশাল রাজপরিবারের কাছে পরম বিস্ময়ের! তারা অবাক হয়ে ভাবে, একটা কাপল কিভাবে এতদিন তাদের বিয়ে টিকিয়ে রাখতে পারে? তাদের দেশ বেলজিয়ামে তো নিত্যই বিয়ে ভাঙছে। বিশ্বে সর্বোচ্চ বিয়েভাঙার রেকর্ডও তাদেরও দেশের। শতকরা ৭১%।

বৃদ্ধ রাজা ভীষণ চিন্তিত! এই সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কী? রাজাকে কেউ একজন বললো,

–এ ব্যাপারে মালয়েশিয়ান ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। তারা এতদিন ধরে এখানে আছে। তাদের ঘনিষ্ঠজনদের মতামত হলো, তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নাকি খুবই মিল। বিয়ে ভাঙা তো দূরের কথা!

রাজা একদিন ডাক্তারকে ডেকে পাঠলেন,

–আচ্ছা, বলো তো, তোমাদের দু'জনের এত মিল-মহব্বতের কারণ কী? তোমাদের দেশের সব স্বামী-স্ত্রীর অবস্থাই কি এমন সুন্দর আর ইতিবাচক?

–জি জাহাঁপনা!

–এ কী করে সম্ভব? আমাকে বিষয়টা একটু খুলে বলো তো!

–আমাদের দেশ মানে মালয়েশিয়া হলো বিশ্বের সবচেয়ে কম বিয়ে ভাঙার দেশ। শতকরা ৭%।

–বলছো কি তুমি! এত্ত কম? এ তো রূপকথার মতো শোনাচ্ছে রে!

–আসলেও তাই। আগে অবস্থা এমন ছিলো না। পরিস্থিতি ভিন্ন ছিলো।

–কেমন?

–এই ২০০৪ সালেও আমাদের দেশে বিয়ে ভাঙার হার ছিল ৩২%। এই এক দশকের মধ্যেই সেটা ৭%-এ নেমে এসেছে।

–কীভাবে সম্ভব হলো এই অসম্ভব কাজটা?

–আমাদের দেশে সরকারীভাবেই একটা সুন্দর নিয়ম চালু করার পরই এই সুফল আসতে শুরু করে।

–খুলে বলো।

–১৯৯২ সালের কথা। আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী দেখলেন, দেশে বিয়ে ভাঙার হার দিনদিন বেড়েই চলছে। তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এভাবে যদি সংসার ভাঙার হার বেড়েই চলে, তাহলে তিনি মালয়েশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে যে উঁচু জায়গায় নিয়ে যেতে চান, তা সম্ভব হবে না।

তাকে আগে পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হবে। তারপরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। মাহাথির মুহাম্মাদ সমস্যাটার সমাধানকল্পে অনেক চিন্তাভাবনা করলেন। অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করলেন। শেষে একটা সমাধান বের করলেন,

–নবদম্পতির জন্যে বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে।

দেশে নিয়ম করে দেয়া হলো,

–যারাই বিয়ে করবে, তাদেরকে লম্বা একটা ছুটি দেয়া হবে। ছুটিটা বিয়ের প্রায় মাসখানেক আগে থেকে শুরু হবে।

বিয়ের আগের সময়টাতে, বর ও কনে উভয়কেই বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নিতে হয়। সেখানে তাদেরকে তা'লীম দেয়া হয়, কিভাবে ঘর-সংসার করতে হবে। কিভাবে দাম্পত্যকলহ মেটাতে হবে। তাদেরকে শেখানো হয়, একসাথে থাকতে গেলে কী কী সমস্যা আসতে পারে, তার সমাধানও কিভাবে করা যায়, ইত্যাদি।

আর বিয়ের পরও নতুন বর-কনেকে একসাথে থাকার জন্যে লম্বা ছুটির ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে দীর্ঘদিন একসাথে লম্বা একটা সময় কাটাতে কাটাতে দু'জনের মধ্যে ভাল একটা বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তৈরী হয়।

জীবন জাগার গল্প : ৪২০

কার আনুগত্য?

মাধ্যমিক স্কুল। ছাত্র-ছাত্রীরা নির্দিষ্ট পোষাক পরে স্কুলে এসেছে। একজন ছাত্রী ব্যতিক্রম করে হিজাব পরে এসেছে। বছরের প্রথমদিন গেলো। দ্বিতীয় দিন গেলো। তৃতীয় দিন একজন শিক্ষিকা ছাত্রীটিকে বললেন,

–৫

–তুমি স্কুলের নিয়মের বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত পোষাক কেন পরেছ? আগামীকাল থেকে শুধু স্কুলের নির্দিষ্ট পোশাক পরে আসবে।

.

ছাত্রীটি পরদিনও ভয়ে ভয়ে একই পোশাক পরে এল। শিক্ষিকা রেগে গিয়ে তাকে কড়া করে শাসিয়ে দিল। এমন যেন সামনে আর না হয়।

.

ছাত্রীটি বেশ বিপাকে পড়লো। বাড়ি ফিরে মাকে সব খুলে বললো। মা বললেন,

–কিন্তু মা এই পোশাক তো আল্লাহর পছন্দের পোশাক!

–আম্মু! আমাদের স্কুলের আপুমণি তো এই পোশাক পছন্দ করেন না!

–তুমিই এখন ঠিক করো, যেই সত্তা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তার পছন্দমত পোশাক পরবে নাকি একজন মানবীর পছন্দমত পোশাক পরবে?

–আমি আমার সৃষ্টিকর্তার পছন্দসই পোশাক পরবো আম্মু!

.

পরদিন ছাত্রীটি আগের পোশাকেই স্কুলে গেল। শিক্ষিকা দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। সাথে সাথে তাকে শ্রেণীকক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। মেয়েটি লজ্জায়-অপমানে কাঁদতে শুরু করলো। শিক্ষিকা জিজ্ঞেস করলেন,

–তুমি তো আগেই কথা শোননি, এখন কাঁদছো কেন?

–আপুমণি! আমি বুঝতে পারছি না, সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। আপনার কথা মেনে নিয়ে 'তাঁর' অবাধ্য হবো নাকি 'তাঁর' আনুগত্য করে আপনার অবাধ্য হবো?

–এখানে 'তাঁর'টা আবার কে?

–আল্লাহ!

.

শিক্ষিকা এবর ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন,

–আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি 'তাঁরই' আনুগত্য করো।

জীবন জাগার গল্প : ৪২১

প্রতিবিম্ব

চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা, গভীর বনের মধ্যে গড়ে এক আদিম জনপদ। সভ্যতার ছোঁয়া থেকে অনেক দূরে। সাগর-নদী থেকেও দূরে। বুনো পশু-পাখি শিকারই এই জনপদের অধিবাসীদের একমাত্র জীবিকা। পেশা ও নেশা।

পাশের পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া ঝরণা তাদের প্রাণের উৎস। এভাবেই তাদের শাদামাঠা জীবন কেটে যাচ্ছিল। সুখে-দুঃখে।

.

এখানকার দুই যুবক, এতদিনের রীতি ভেঙে একদিন পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠল। তাকিয়ে দেখে বহুদূরে বিশাল একটা জলাশয়। কৌতূহলী হয়ে দুজনেই সেদিকে পা বাড়াল। কাছাকাছি গিয়ে, দুইজন দুইটা গাছে উঠে নীচের জলাশয়ের দিকে তাকাল।

.

প্রথম যুবক গাছে উঠেই দেখল সুন্দর ফুল ফুটে আছে। ফল ধরে আছে। মনের আনন্দে খেতে শুরু করে দিল। পেট পুরে খেয়ে, হাসিমুখে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল তার মতো আরেকজন লোক তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে।

এই নির্জন জলাশয়ে আরেকজন মানুষ দেখে সে খুশি হয়ে তার সাথে ইশারায় কথা বলতে শুরু করলো। মনে মনে তাকে এক প্রকার বন্ধু হিশেবেই গ্রহণ করে ফেললো।

.

দ্বিতীয় যুবক যে গাছে উঠল সেটাতে ছিল ভীমরুলের চাক। আর গাছটাও কাঁটায় ভর্তি। কাঁটার ঘায়ে, বোলতার হুলে বেচারা দিশেহারা হয়ে গেল। এর মধ্যে তার চোখ পড়লো পানিতে। সে দেখলো তার মতো একজন যুবক তাকে ভেঙাচ্ছে। সেও পাল্টা ভেংচে দিল। অবাক করা ব্যাপার হলো, পানির যুবকও উত্তরে তাকে ভেংচে দিল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল ঘনিয়ে এলো। দুজনে এবার বাড়িমুখো হলো। সবাই ছেঁকে ধরলো গল্প শোনার জন্যে।

প্রথম যুবক বললো,

-আমি সেখানে মজার মজার ফল খেয়ে আর ফুলের সুবাস নিয়েই দিনটা কাটিয়ে দিয়েছি। একজন সুন্দর হাসিমুখের বন্ধুও জুটিয়েছি। তার সাথে দেখা করার জন্যে আমি আবার সেখানে যাব।

দ্বিতীয় যুবক বললো,

–বাজে একটা জায়গায় গিয়েছি। কাঁটা আর ভীমরুলে ভর্তি। আবার সেখানে কুৎসিত এক লোকও থাকে। লোকটা শুধু মানুষ ভেংচি কাটে আর অপমান করে।

= এটাই আমাদের জীবন। আমরা তার সাথে যেমন আচরণ করবো, জীবনও আমাদেরকে তেমন প্রতিদান ফিরিয়ে দেবে।

জীবন জাগার গল্প : ৪২২

ক্যামেরা

শহরের সবচেয়ে বড় সুপার শপ। নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই থরে থরে সাজানো। একজন গরীব লোক ভুলক্রমে শপে ঢুকে পড়লো। লোকটা অবাক, এত বড় দোকান কিন্তু কোনও কর্মচারী নেই। তাই বলে দোকানে ক্রেতারও অভাব নেই। অসংখ্য ক্রেতা এটা সেটা নিজের ইচ্ছেমতো বেছে নিচ্ছে, ক্যাশে গিয়ে দাম পরিশোধ করছে।

লোকটা চারদিকে চেয়ে দেখল, সবাই যে যার কেনাকাটায় ব্যস্ত-মগ্ন। কেউ কারো প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছে না।

তার মনে চিন্তা এল, আমি যদি কিছু জিনিস আমার পকেটে ঢুকিয়ে ফেলি কেউ তো দেখতে পাবে না। পেটে ক্ষুধা ছিল, সামনে মজার মজার টফি আর চকলেট দেখে লোভ সামলাতে পারল না। গপাগপ বেশ কয়েকটা চকলেট খেয়ে ফেললো। কয়েক টুকরা কেকও খেল।

এরপর মুখ মুছে, টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিসপ্রত্র পকেটে, সাথে নিয়ে আসা থলেতে ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে বের হয়ে এল।

ক্যাশে বসে থাকা কেউ তার দিকে লক্ষ্য করেনি। তারা টাকা নেয়ায় ব্যস্ত। লোকটা কোনও বাধা ছাড়াই, নিরাপদে দোকানের দরজা পার হয়ে এল। হাঁফ ছেঁড়ে যেই মূল গেইট দিয়ে বের হতে যাবে, এমন সময় একজন উর্দিধারী প্রহরী এসে তাকে ধরে একটা কামরায় নিয়ে গেলো।

–তুমি চুরি কেন করেছো?

–কই, কোথায়? আমি কিছুই চুরি করিনি।

প্রহরী তখন সামনে থাকা কম্পিউটারে কিছু একটা করলো, গরীব লোকটা অবাক হয়ে দেখলো, এতক্ষণ সে যা যা করেছে, সবই এখানে দেখা যাচ্ছে। এবার তো আর অস্বীকার করার জো নেই।

(এটা তো বান্দার তৈরী ক্যামেরার কারসাজি। আল্লাহর তৈরী ক্যামেরার কাজটা কেমন হবে?)

জীবন জাগার গল্প : ৪২৩

কথোপকথন

বাবা মায়ের চাপে পড়ে, বাধ্য হয়ে যুবক কুরআন তিলাওয়াত করতে বসলো। এক বন্ধু এসে তাকে ডাক দিলো, হাঁপ ছেড়ে উঠে ঘরের বাইরে গেলো। ভুলে মোবাইলটা রয়ে গেলো। মোবাইলটা অক্ষেপ করে কুরআন শরীফকে বললো,

–এই প্রথমবার সে আমাকে ভুলে ফেলে গেলো।

কুরআন: দুঃখ করো না, আমাকে তো সবসময়ই ভুলে থাকে।

–দুঃখ না করে থাকি কী করে? আমি সবসময় তার সাথে কথা বলি। সেও আমার সাথে কথা না বলে থাকতে পারে না।

–তোমার অবস্থা তো ভালই। আমি তার সাথে সবসময় কথা বলি, কিন্তু কে শোনে কার কথা। সে এমনভাবে থাকে যেন আমার কথা শুনতেই পায়নি!

–আমার কাছে কত রকমের মেসেজ আছে। গেমস আছে, আনন্দ-বিনোদন আছে। আরো কত কী! তবুও আমাকে রেখে গেল?

–আরে, আমি তো পুরোটাই মেসেজ! আমার মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর সুসংবাদ আছে, কত আনন্দদায়ক আর মজাদার গল্প আছে। কত আশাব্যঞ্জক প্রতিশ্রুতি আছে। তবুও আমার কদর কোথায়? আমাকে তো দিনের পর দিন ছুঁয়েই দেখে না!

–অবশ্য এটাও ঠিক যে, আমার মধ্যে শরীর ও মস্তিস্কের জন্যে অনেক ক্ষতিকর রশ্মি আছে, তবুও তো সে আমাকে ছেড়ে একদণ্ড তিষ্টোতে পারে না।

–আর আমি তো পুরোটাই শরীর-মন-আত্মার জন্যে আরোগ্যস্বরূপ। এতকিছুর পরও আমাকে ছেড়ে থাকে।

–আমার নানা দোষত্রুটি সত্বেও আমাকে নিয়ে সে তার বন্ধুদের কাছে গর্ব করে বেড়ায়। বারবার পকেট থেকে বের করে দেখায়।

–এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি গর্ব করার মতো কিছু থেকে থাকলে সে হলাম আমি। অথচ আমাকে নিয়ে বন্ধুদের সাথে কথা বলতে সে লজ্জা পায়। বন্ধুদের সামনে আমাকে বের করতে দ্বিধায় ভোগে।

–আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমাকে এখন যেতে হবে। ওই তো আমাকে নেয়ার জন্যে সে দৌড়ে আসছে। আমি বলিনি, সে আমাকে ছাড়া একদন্ড টিকতে পারে না!

–ঠিক আছে যাও। কী আর করা! অথচ অবস্থা হওয়ার কথা ছিল উল্টো!

জীবন জাগার গল্প : ৪২৪

ব্যথার তাড়না

রাজা নিজের তাঁবুতে বসেই যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। রাজা দেখলেন যুদ্ধের ময়দানের একটা জায়গায় তার সৈন্যরা বেশ মার খাচ্ছে, টিকে থাকতে পারছে না। অভিজ্ঞ কাউকে পাঠানো যায় কি না ভাবছেন। এরেই মধ্যে দেখলেন আরেক দিক থেকে তার একজন সাধারণ সৈন্য, ছুটে গিয়ে সেই দুর্বল ফ্রন্টে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অমিত তেজে, বিপুল বিক্রমে মরণপণ লড়াই শুরু করে দিল। দেখাদেখি অন্যরাও সাহসী হয়ে উঠলো। অল্পসময়ের মধ্যে চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেল। শত্রুপক্ষীয় সেনারা আস্তে আস্তে পেছাতে শুরু করলো। সেদিনের মতো যুদ্ধ শেষ হলো।

পরদিনও ঠিক একই অবস্থা। রাজা কৌতূহলী হয়ে সেই অপরিচিত অকুতোভয় বীরকে ডেকে পাঠালেন। প্রশংসার সুরে বললেন,

–তোমার কারণে তো পুরো বাহিনীই চনমনে হয়ে উঠছে। চূড়ান্ত বিজয়ও হাতের নাগালে এসে গেছে প্রায়।

রাজার কথা শুনে অপরিচিত বীর যুবক বললো,

–জাহাঁপনা! আমি আমার দেশকে ভালবাসি। দেশের জন্যে আমি মরতেও ভয় পাই না।

রাজা চমৎকৃত হলেন। স্নেহের সুরে বললেন,

–তোমার যদি কিছু চাওয়ার থাকে বলো। আমি পূরণ করার চেষ্টা করবো।

–আমার চাওয়ার কিছুই নেই। আর ক'দিনইবা বাঁচববো। যে কটা দিন বাঁচি, আপনার আর দেশের সেবা করে যেতে চাই।

–কেন, বাঁচবে না কেন? যুদ্ধ করলেই বুঝি মানুষ মরে যায়?

–না, তা নয়। আসলে আমি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছি। ডাক্তার বলেছে আমার আয়ু আর বেশিদিন নেই।

–রোগটা কী?

–সারাক্ষণই পুরো শরীর ব্যথা করে। অসহ্য ব্যথা। সেজন্যই আমি চাই, যুদ্ধ করে মরে গিয়ে এই জ্বালা জুড়োই! এমনিতেই যখন মরবো, যুদ্ধে গিয়েই মরি!

.

তরুণ সৈন্যের কথা শুনে রাজা ভীষণ দুঃখ পেলেন। রাজ চিকিৎসককে হুকুম দিলেন, তরুণ সৈন্যের চিকিৎসার ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখতে।

অভিজ্ঞ রাজচিকিৎসকের আন্তরিক চেষ্টায় যুবক দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠলো। এখন আর আগের মতো শরীরে ব্যথা-বেদনা-শূল নেই।

ক'দিন পর আরেক রাজার সাথে যুদ্ধ বাঁধল। রাজা দেখলেন সেই নির্ভীক যুবক ময়দানে নেই। খোঁজ নিলেন। জানতে পারলেন, যুবকটা সুস্থ হওয়ার পর, যুদ্ধের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। সে এখন বিয়ে করে ঘর সংসারে মনোযোগ দিয়েছে।

.

❖ ব্যথা না থাকলে জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না। ভেতরে স্বপ্নের ব্যথা থাকতে হয। উচ্চাকাঙ্খার ব্যথা থাকতে হয়।

❖ আবার আমাদের কেউ কেউ বিপদে পড়ে কিছুদিনের জন্যে ধার্মিক-নামাযী হয়ে যায়। বিপদ কেটে গেলেই আগের দশা!।

জীবন জাগার গল্প : ৪২৫

কৃতকর্মের ফল

বিয়ে হয়েছে সবে কয়টা মাস হলো। এখনো দুজনের কারোরই ঘোর কাটেনি। স্বামী বেচারা একটা সংবাদে বেশ বিচলিত হয়ে পড়লো। স্ত্রীও খবরটা শুনে মুষড়ে পড়লো।

•

তার বাণিজ্যিক কাফেলা কয়েকদিন পর রওয়ানা হয়ে যাবে। এতদিন ধরে এই কাফেলা নানা কারণে বের হতে পারছিল না। পর্যাপ্ত প্রহরী পাওয়া যাচ্ছিল না। এবার মিলে গেছে। কাফেলার সর্দার আর দেরি করতে চান না।

•

ঘরে নববধূ রেখে কারই বা ব্যবসায়িক সফরে যেতে মন চায়? সমস্যা দেখা দিল, বাড়িতে আর কেউ নেই। একা একা একজন তরুণী বধূ কিভাবে থাকবে? তার নিরাপত্তার দিকটা কে দেখবে? স্ত্রীর সাথে রেখে যাবে এমন কোনও আত্মীয়ও নেই। অগত্যা বাধ্য হয়ে, পাশের বাড়ির বন্ধুকে বলল একটু খেয়াল রাখতে।

•

প্রথম প্রথম বন্ধুটি নিজের স্ত্রীকে পাঠিয়ে খোঁজ-খবর নিতে লাগল। বাজার-সদাই, টুকিটাকি গৃহস্থালি কাজেও হাত লাগাল। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর, বন্ধুটি বউকে না পাঠিয়ে, নিজেই ঘরে আসা-যাওয়া শুরু করলো।

•

আরও কয়েকদিন পর, নানা ইশারা-ইঙ্গিতে কিছু কথা বলতে শুরু করলো। আর কয়দিন পর আর পর্দা না মেনে সরাসরি ঘরে ঢুকতে শুরু করলো। একদিন সরাসরিই মন্দ কাজের প্রস্তাব দিল। বন্ধুর স্ত্রী বললো,
—আমার স্বামী না দেখলে কী হবে, আমার আল্লাহ তো দেখছেন।

•

একথা শোনার পর, বন্ধুটি চুপচাপ চলে গেলো। পরদিন আবার একই ঘটনার পুনারাবৃত্তি ঘটলো। যতই দিন যেতে লাগল, ততই বন্ধুটির আচরণ বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগলো।

•

একদিন দুপুরে হঠাৎ স্বামী এসে উপস্থিত। তার আগমন সংবাদ পেয়ে পাশের বাড়ির বন্ধুটি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। কোনও ভূমিকা ছাড়াই তার স্ত্রীর নামে যা তা বললো। স্বামী বন্ধুর কথা শুনে, কোনও চিন্তাভাবনা ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বসলো। শুধু তাই নয়, বন্ধুর প্ররোচনায়, স্ত্রীকে তখনি ঘর থেকে বের করে দিল।

•

অসহায় তরুণীর ইহকুলে কেউ নেই যে তার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিবে। অসহায়-নিরূপায় হয়ে সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকল। অনেকদূর হাঁটার পর, রাস্তার পাশে একটা খানকা দেখতে পেল। ভেতরে একজন বুযুর্গ সূরত বৃদ্ধ বসে আছেন। কাছে গিয়ে নিজের অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরে বললোঃ

–কোনও কাজ থাকলে আমাকে দিন। সুন্দরভাবে করে দিবো।

–আমার একটা ছোট ছেলে আছে। কিছুদিন হলো তার মা মারা গেছে। তুমি তার দেখাশোনা করো। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে।

•

বুযুর্গের বাড়িতে দিনগুলো আরামেই কেটে যেতে লাগল। একদিন বুযুর্গ পাশের গ্রামে দাওয়াতে গিয়েছেন। এই সুযোগে বাড়ির পুরুষ কাজের লোকটা এসে, তাকে ফুসলাতে লাগল। তরুণী সাড়া দিলো না। যুবকের এই সতীপনা সহ্য হলো না। যুবক করল কি, বুযুর্গের ছেলেটাকে মেরে ফেলল। তারপর দৌড়ে গিয়ে বুযুর্গের কাছে গেলো।

–সেই পিশাচিনী মহিলাটা আপনার ছেলেকে মেরে ফেলেছে।

বুযুর্গ প্রচণ্ড রেগে গেলেন। আবার সাথে সাথে কুরআনের আয়াত স্মরণ করে, রাগ হজম করে ফেললেন। বাড়ি এসে, তরুণীকে তার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বললেন,

–যাও আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। তুমি এখন আমার ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাও। তোমার প্রয়োজন তো ফুরিয়েছে।

বুযুর্গ রাগ দমন করতে পারলেও, তরুণীকে জিজ্ঞেস করার কথা তার মাথায় এলো না।

•

তরুণী আবার অজানার পথে পা বাড়াল। একটা বাজারে গিয়ে দেখলো, একদল লোক একটা লোককে হাত-পা বেঁধে বেদম প্রহার করছে। কাছে গিয়ে জানতে চাইলো,

–তোমরা লোকটাকে এভাবে মারছো কেন?

–লোকটার কাছে আমরা টাকা পাব। দিচ্ছে না। যদি আজ না দিতে পারে, তাকে আমরা দাস হিশেবে বিক্রি করে দিবো।

–তোমরা কত টাকা পাবে?

–একশ দেরহাম।

–এই নাও দেরহাম। তাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।

.

লোকটা মারের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ভীষণ কৃতজ্ঞ বোধ করলো। তরুণীকে বললো,

–আপনি এখন আমার মনিব। যা বলবেন আমি শুনবো।

–না তার দরকার নেই। তুমি তোমার কাজে যাও।

–আমার কোনও কাজ নেই। বাড়িঘরও নেই। আমি আপনার দাস হিশেবে থাকতে চাই।

–ঠিক আছে চলো।

.

দুজনে পথ চলতে চলতে একটা জাহাজঘাটায় এল। দুজনেরই ইচ্ছা, এই জুলুমের দেশ ছেড়ে দূরদেশে চলে যাবে। জাহাজে চড়ার আগমুহূর্তে লোকটা বললো,

–আপনি আগে উঠুন। আমি একটা কাজ সেরে আসছি।

লোকটা এবার জাহাজের নাবিকের কাছে গিয়ে বললো,

–ঐ যে একটা মহিলা দেখা যাচ্ছে, সে আমার বাঁদী। আমি তাকে বিক্রি করবো। আপনি কি তাকে কিনবেন?

–হ্যাঁ।

লোকটা দাম নিয়ে পালিয়ে গেল। জাহাজ নোঙ্গর তুলে চলতে শুরু করলো। তরুণী হন্যে হয়ে সঙ্গীকে খুঁজল। কোথাও না পেয়ে নাবিকের কাছে গিয়ে বললো,

–আমার সঙ্গী তো এখনো এলো না। জাহাজটা একটু পরে ছাড়ুন।
–কোথায় তোমার সঙ্গী? সে তো তোমার মনিব। তোমাকে আমার কাছে বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে। যাও আমার ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে ফেল। তাড়াতাড়ি।
কিছুক্ষণ পর নাবিক তার ঘরে এল। তরুণীকে তার কাছে যেতে বললো। তরুণী তীব্রভাবে অস্বীকার করলো। নাবিক মদ খেয়ে মাতাল হয়ে, তাকে ধরতে এল। এমন সময় পুরো জাহাজ দুলে উঠলো। বাইরে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়েছে। প্রবল ঝড়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে জাহাজটা ডুবে গেল।

.

দেশের রাজা তখন সাগর তীরে রানীকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন। রাজার চোখ পড়লো সমুদ্রে ভাসমান একটা তরুণীর প্রতি। প্রহরীদেরকে আদেশ করলেন, তাকে তুলে আনতে। রাজচিকিৎসককে ভালো করে চিকিৎসা করতে বললেন। ভাল সেবা-যত্ন পেয়ে তরুণী অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠলো। রাজা তাকে ডেকে পাঠালেন। তরুণী আগাগোড়া-আদ্যোপান্ত সব খুলে বললো। রাজা তরুণীর ধৈর্য্য, সততা, সবর, বুদ্ধিমত্তা, উদারতা দেখে ভীষণ মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

.

রাজমাতার পরামর্শে রাজা তাকে বিয়ে করে ফেললেন। অল্প ক'দিনের মধ্যে তরুণী রাজ্য পরিচালনার খুঁটিনাটি সব শিখে গেল। রাজা যে কোনও কাজ তার পরামর্শ নিয়েই করেন। দিনদিন তরুণীর বুদ্ধিমত্তা, দানশীলতার কথা রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

.

বেশ কিছুদিন সুখে শান্তিতে বসবাস করার পর, রাজা মারা গেলেন। দেশের গণ্যমান্যরা মিলে ঠিক করলো, রানীই তাদের রাজ্যের শাসনভার নিবেন।

.

কিছুদিন যাওয়ার পর, এক উৎসবের দিন, রাজ্যের সমস্ত পুরুষ মানুষকে একটা ময়দানে হাজির হতে বললেন। সবাই হাজির হলো। রানী খুঁজে খুঁজে তার কাঙ্খিত ব্যক্তিদেরকে আলাদা করলেন। তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। এবার পূর্বের স্বামীর দিকে ফিরে বললেন,
–তুমি তোমার বন্ধুর কথায় ধোঁকা খেয়ে আমাকে অন্যায়ভাবে তালাক দিয়েছিলে। তবুও তোমাকে আমি নির্দোষ মনে করে ছেড়ে দিচ্ছি।

কিন্তু তোমার বন্ধু আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। তাকে শাস্তি দেয়া হবে।
এবার বৃদ্ধ বুযুর্গের দিকে ফিরে বললেন,
-আপনিও নির্দোষ। আপনাকে চাকর ভুল বুঝিয়েছে। তাকে হত্যা করা হবে। কারণ সে আপনার ছেলেকে হত্যা করেছে।
এরপর দুষ্ট লোকটির দিকে ফিরে বললেন:
–তোমাকে বন্দী করা হবে। বিশ্বাঘাতক। তুমি উদ্ধারকারীকে পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে পিছপা হওনি।

এভাবেই সবাই যার যার কৃতকর্মের শাস্তি পেয়ে গেল।

জীবন জাগার গল্প : ৪২৬

সারপ্রাইজ

শায়খ উমর বাহযাদ বলেন,
–দপ্তরে বসে একটা ফতোয়া নিয়ে কাজ করছিলাম। একটা ফোন এলো।
–আমি একজন কলেজ ছাত্রী। একটা মাসআলা জানার ছিল।
–জি বলো।
-আচ্ছা আমি কি আব্বু-আম্মুকে না জানিয়ে কুরআন কারীম হিফয করতে পারবো?
–কেন পারবে না। অবশ্যই পারবে। তা তোমার বাবা-মা বুঝি ধর্মপালন পছন্দ করেন না?
–না না, শায়খ। এমন নয়। তারা দুজনেই অত্যন্ত পরহেযগার।
–তাহলে লুকোতে চাইছ কেন?
–শায়খ! আপনি তো জানেন, হাফেযের পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন নূরের তাজ পরানো হবে।
–জি।
–আমি কিয়ামতের দিন আব্বু-আম্মুর মাথায় তাজ পরিয়ে তাদের দুজনকে সারপ্রাইজ দিতে চাই।

জীবন জাগার গল্প : ৪২৭

জান্নাতে রাতযাপন

গ্রামে আগুন লেগে অধিকাংশ ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এমনিতেই গ্রামটা দরিদ্র। তার ওপর আবার এমন দুর্ঘটনা। অসহায় মানুগুলো পথে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটানো ছাড়া কোনও উপায় রইল না।

.

খাবার-দাবার, টাকা-পায়সা যা ছিল সবই পুড়ে গেছে। গ্রামে কোন কর্মসংস্থান নেই। কামলা খাটার জায়গা নেই। সবার অবস্থাই তো এক! কে কাকে কাজ দিবে?

.

গ্রামের যুবকেরা কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। পাশের গ্রামে অনেক পয়সাওয়ালা লোকেরা বাস করে। কয়েকটা কারখানাও আছে। বেশিরভাগ যুবকই সেখানে চাকুরি নিল।

.

একটা মহল্লার পাঁচজন যুবকও একটা চিনিকলে চাকুরি নিল। একটা ছোটখাটা ছাপড়া ঘর ভাড়া নিল রাত যাপনের জন্যে। সারাদিন কাজ করে, রাতে ছাপড়া ঘরে এসে ঘুমায়। সাপ্তাহিক ছুটির দিন দলবেঁধে বাড়ি ফেরে।

.

কিন্তু একজন যুবক ব্যতিক্রম। সে সবার সাথে ছাপড়া ঘরের ভাড়া পরিশোধ করলেও, প্রতিদিন বিকেলে নামায পড়েই বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়। রাতটা বাড়িতে থেকে সকালে আবার হাঁপাতে হাঁপাতে কাজে যোগ দেয়।

.

এটা নিয়ে বন্ধুরা তাকে নানা কথা বলে। টিটকারি মারে। ঘরকুনো বলে খেপায়। একদিন সবাই তাকে ধরে বসলো।

–কিরে তুই তো এখনো বিয়ে করিসনি। তবুও প্রতিদিন এমন খ্যাপার মতো, দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে, বাড়িতে ছুটে যাস কেন?

–আমি রাতটা জান্নাতে কাটাতে যাই।

–কী বললে, জান্নাতে রাত কাটাতে যাও? যাক এবার নিশ্চিত হলাম, তোমার মাথায় আসলেই ছিট আছে। এক কাজ করো, আগামী ছুটির দিনে, শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখাও।

–আমার মাথা ঠিকই আছে। আমি মনে করি, তোমাদের মধ্যে বরং সমস্যা আছে।

•

একথার পর দু'দলে ঝগড়া লেগে গেল। ঝগড়ার আওয়াজ শুনে, পাশের মসজিদ থেকে ইমাম সাহেব এলেন।

–তোমরা এভাবে ঝগড়া করছো কেন?

একজন হুযুরকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল। ইমাম সাহেব তখন বাড়ি যাওয়া যুবককে প্রশ্ন করলেন,

–বলো তো তুমি কেন প্রতিদিন রাতে বাড়ি চলে যাও?

–হুযুর! বাড়িতে আমার বৃদ্ধা মা আছেন। তিনি রাতে চোখে দেখেন না। কারো সাহায্য ছাড়া চলতে ফিরতেও কষ্ট হয়। দিনে যাওবা পারেন, কিন্তু রাতে একদমই অচল হয়ে পড়েন।

এজন্য প্রায়ই তার ইশা ও ফজর নামায কাযা হয়ে যায়। আমি প্রতিদিন বাড়ি গিয়ে আম্মুকে রাতের খাবার রান্না করে খাওয়াই। ইশার নামায পড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেই।

আম্মু রাতে প্রয়োজন সারতে উঠেন। তাই আমিও তাঁর পায়ের দিকটাতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকি।

মধ্যরাতে মাকে একবার বাহির থেকে ঘুরিয়ে আনি। শেষ রাতে নামায পড়িয়ে, নাশতা বানাতে বসি। রান্না হয়ে গেলে, তাকে খাইয়ে তারপর কাজে আসি।

•

আর এ তো জানা কথা, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।

জীবন জাগার গল্প : ৪২৮

হেডফোনের গান

শায়খ মুহাম্মাদ সাবি। তিনি একদিনের ঘটনা শোনালেন,

–আমি সিরিয়ায় গিয়েছিলাম। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটা ক্লাস নিতে। আমাদের ক্যাম্পাসের পাশ দিয়েই রেল লাইন। মসজিদটাও রেল লাইন ঘেঁষে। ইশার নামায পড়ে সালাম ফিরালাম। রাতের ট্রেনটা সিটি বাজিয়ে যাচ্ছে। একজন লোক চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর আরও অনেকেই হৈ চৈ করে উঠলো। বাইরে অনেক মানুষের পায়ের শব্দ। দৌড়ে যাচ্ছে।

আমরাও বের হয়ে এলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম এক যুবকের দ্বিখণ্ডিত দেহ রেললাইনের ধারে পড়ে আছে। শরীরটা (লম্বালম্বি) মাঝামাঝিতে কাটা পড়ে দুই ভাগ হয়ে গেছে। ডানপাশটা অক্ষত আছে। বামপাশটা একদম নেই। আশ্চর্যের বিষয় হলো যুবকের শরীরে তখনো প্রাণ আছে। ভীষণ ব্যাথায় চোখমুখ কেমন হয়ে আছে। আওয়াজ বের হচ্ছে না।

.

আমাদের একজন ছেলেটার চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারলো আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। তাড়াতাড়ি গিয়ে তার মাথাটা কোলে তুলে নিল। কানে কানে বললো,

–বলো! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

যুবক আওয়াজ পেয়ে চোখ খুলল। কী যেন একটা বলতে চাইল। লোকটা আবার কানের কাছে গিয়ে কালিমা পড়তে বললো। আমরা দেখলাম এবার আর যুবকটা দেরি করল না। বেশ স্পষ্ট আওয়াযে কালিমা পড়লো। পড়া শেষ করেই মারা গেল।

.

শরীরের কাটা যাওয়া অংশসহ মৃত যুবককে সবাই মিলে ধরাধরি করে মসজিদ চত্বরে নিয়ে এলাম। যুবককে কেউ চিনতে পারছিল না। কিভাবে ট্রেনের নিচে পড়লো কেউ বলতে পারল না। ঠিকানাও জানা নেই। একজন বললো,

–লোকটার জামা-কাপড় হাতড়ে দেখ, ওখানে ঠিকানা মিলতে পারে।

কোলে নেয়া ব্যক্তিটি এগিয়ে শার্ট হাতড়াতে গিয়ে দেখল যুবকের গলায় ক্রুশ ঝুলছে। উপস্থিত সবাই বিস্ময়ে সুবহানাল্লাহ বলে উঠলো।

.

যুবকের পকেটে মোবাইল পাওয়া গেল। নাম্বার নিয়ে বাড়িতে ফোন করা হলো। জানা গেলো খুবই কাছেই খ্রিস্টান এলাকায় তার বাসা।

আমরা একটা গাড়িতে করে মৃতদেহ নিয়ে চললাম। পরিবারের সম্মতিক্রমে মুসলিম রীতিতে তাকে দাফন করবো। গাড়ি খ্রিস্টান পল্লীর গলির মুখে পৌঁছতেই এক বৃদ্ধ লোক ছুটে এল। তার দু'চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে।

প্রাথমিক শোকের চাপ কমে এলে আমরা শোকাহত বাবাকে সব খুলে বললাম। বাবা ছেলের মুসলমান হওয়া কথা শুনে চেহারাটা মলিন করে বললেন:

–আমি জানতাম এমন একটা কিছু ঘটবে। কিন্তু সেটা যে এভাবে ঘটবে কল্পনা করতে পারিনি।

–কেন আপনি এমন ধারণা করতেন?

–সে অনেক লম্বা কাহিনী। তার এক ফুফু থাকে সুইজারল্যান্ডে। আবদে রূহ মানে আমার এই ছেলেটার সাথে সেই নিঃসন্তান ফুফুর খুবই ভাল সম্পর্ক। আমার ভগ্নিপতি মানে ছেলের ফুফা চাকুরি করে সুইস গার্ডে। মানে ভ্যাটিকান সিটিতে। দুই দেশের দুইজনের বিয়েটারও এক চমকপ্রদ কাহিনী আছে।

.

গত কয়েক বছর আগে, সুইজারল্যান্ডে মসজিদের মিনার নির্মাণ নিয়ে ভীষণ গণ্ডগোল হয়েছিল। তখন আমার ভগ্নিপতি সেই ঘটনার সাথে কিভাবে যেন জড়িয়ে পড়েছিল। সে তখন ছুটিতে ছিল। সেসময় সে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে। তার স্ত্রী মানে আমার বোন আরব খ্রিস্টান, তাই মুসলিম না হলেও ইসলাম সম্পর্কে জানবে মনে করে তার কাছে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইল। নিভীন (আমার বোন) বললো,

–তোমাকে সন্তুষ্ট করার মতো জ্ঞান আসলে আমারও নেই। একটু অপেক্ষা করো। আবদে রূহকে ফোন করে বলি, দিমাশক থেকে কিছু আরবী কিতাব পাঠিয়ে দিক।

আবদে রূহ তার ফুফা-ফুফুর জন্যে কিতাব কেনার সাথে সাথে কুরআনও পাঠিয়ে দিল। যে দোকান থেকে কিতাব কিনল, তারা ক্রেতা খ্রিস্টান দেখে, ফ্রি কয়েকটা কুরআন তিলাওয়াতের সিডিও দিয়ে দিল।

.

ফুফুর জন্যে আনা কুরআন তিলাওয়াত আমার ছেলেও শুনতে শুরু করলো। ছেলেটা আমার উম্মে কুলসুমের খুবই ভক্ত ছিল। সারাদিন কানের মধ্যে হেডফোন লাগিয়ে উম্মে কুলসুমের গান শুনতো।

আমি ভাবতাম এখনো বুঝি সে গান শুনছে। একদিন সে আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়, তার হেডফোন ছাপিয়ে একটা সুরেলা আওয়াজ এলো। ঠিক গানের মতো লাগল না আওয়াজটাকে। আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

–কী শুনছিস?

সে থতমত খেয়ে বললো:

–কেন গান শুনছি!

.

তার চোরা ভাব দেখে আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। একদিন আমি জোর করে তার কান থেকে হেডফোন কেড়ে নিয়ে দেখি সে কুরআন তিলাওয়াত শুনছে। আমি তাকে এসব ছেড়ে দিতে বললাম। সে ছেড়ে দিবে বললো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল দিনদিন তার শোনার নেশা বেড়েই চলছিল। ওদিকে আমার বোন প্রথমবার পাঠানো কিতাবগুলো পেয়ে যেন পাগল হয়ে গেল, আরও আরও কিতাব পাঠাতে বললো।

.

আমি এত বাড়াবাড়ি আর সহ্য করতে না পেরে, ছেলেকে হুমকি দিলাম,

–তুই যদি এসব শোনা বন্ধ না করিস, তোকে পাড়ার ছেলেদের দিয়ে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করবো।

ছেলে বললো,

–তুমি চাইলেও আমাকে মেরে ফেলতে পারবে না।

.

এটুকু বলে বৃদ্ধ বাবা থামলেন। বললেন,

–ওই কুরআন শোনা ছাড়া, ছেলেটা আমার খুবই ভাল। লেখাপড়ায় ভাল।

স্বভাব-চরিত্রে ভাল। কিন্তু সে আমাকে ছেড়ে আগেই চলে গেল। এভাবে চলে যাবে ভাবতে পারিনি।

আমি এখন কী নিয়ে বাঁচবো? তারপরও শেষ ক'টা দিন, আমার ছেলে যেটাকে ভালবেসেছে, আমিও সেটাকে ভালবাসি। যদি একটু সান্ত্বনা পাই।

-আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

জীবন জাগার গল্প : ৪২৯

কোথাকার বাসিন্দা?

এক লোকের মাথায় অনেক দিন ধরেই একটা প্রশ্ন বেশ ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রশ্নটা তাকে বেশ ভোগাচ্ছে।

–সে কি দুনিয়ার বাসিন্দা না আখেরাতের বাসিন্দা?

আশেপাশের অনেককে প্রশ্নটা করলো। কেউ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারল না।

.

একজন বুযুর্গ আলেমের কাছে গিয়ে প্রশ্নটা করলো। হুযুর বললেন:,

-আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মানুষকেই একটা পাল্লা দিয়েছেন। সেটা দিয়েই মানুষ নিজের ভালোমন্দ যাচাই করে নিতে পারে। তুমিও পারবে। কারণ তুমি মানুষকে শত ধোঁকা দিতে পারলেও নিজেকে কখনো ধোঁকা দিতে পারবে না। তুমি নিজেই মেপে বের করতে পারবে, তুমি কোথাকার বাসিন্দা।

–কিভাবে?

–ধরো তোমার বাড়িতে একজন দুইজন লোক এলো। একজন তোমাকে হাদিয়া বা অন্য কোনও কারণে বেশ কিছু টাকা দিতে এসেছে। একটু পরই একজন ভিক্ষুক তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছে।

তুমিই বলো, কার আগমনে বেশি খুশি হবে? একজন দিতে এসেছে, আরেকজন নিতে এসেছে।

প্রশ্নকারী চুপ করে থাকলো। উত্তর দিলো না। বুযুর্গ বললেন,

–তুমি যদি ভিক্ষুকের আগমনে বেশি খুশি হও, তাহলে তুমি আখেরাতের বাসিন্দা। আর যদি উল্টোটা হয় তাহলে তুমি দুনিয়ার বাসিন্দা।

জীবন জাগার গল্প : ৪৩০

ধারণা

বাড়িতে একজন মেহমান বেড়াতে এসেছেন। মায়ের বান্ধবী। অনেকদিন পর দেখা। দু'জনে কথা বলছেন। ছোট্ট মেয়েটা অদূরে খেলছে। তার সামনে ছোট্ট তেপায়ার ওপর দুইটা আপেল রাখা।

মা মেয়েকে বললেন,

–মামণি! আপেল দুইটা আমাকে দাও।

–কেন?

-খাওয়ার জন্যে।

একথা শোনামাত্রই মেয়েটা দু'টো আপেল হাতে নিয়েই একটা আপেলে অতিদ্রুত কামড় বসিয়ে দিল। মুখের আপেলটুকু খাওয়ার পর অপর আপেলেও অত্যন্ত দ্রুত একটা কামড় বসিয়ে দিল।

ছোট্ট মেয়ের এহেন লোভী আচরণ দেখে, মায়ের বান্ধবীর চক্ষু চড়কগাছ! কী খাউয়া মেয়ে রে বাবা! থাকতে না পেরে বান্ধবীকে বলেই ফেললো,

–কি রে! মেয়েকে শাসন করিস না! এভাবে চললে তো মেয়ে বড় হতে হতে কী যে হবে!

বান্ধবী কথা শেষ করতে না করতেই ছোট্ট মেয়ে বলে উঠলো,

–আম্মু নাও, এটা বেশি মিষ্টি!

জীবন জাগার গল্প : ৪৩১

জামা বদল

ছাত্র বেশি হওয়ার কারণে স্কুলে দুইটা পর্বে ক্লাশ হয়। সকাল আর বিকেল। উভয় পর্বের জন্যে আলাদা আলাদা ব্যবস্থা। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে। প্রথম ক্লাশ শুরু হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেল। শিক্ষক পড়ানো শুরু করেছেন। প্রায় মাঝামাঝি পর্যায়ে আছেন। একজন ছাত্র এলো। ভেতরে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

শিক্ষক ছাত্রটাকে দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন,

–আজ আর তোর নিস্তার নেই। তোকে আর কতদিন বলবো, ক্লাশ শুরু হওয়ার আগেই হাজির হয়ে যাবি। আমার কথা তো তোর কানে যায় না।

শিক্ষক বেত হাতে নিয়ে কষে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন।

–বল, কেন প্রতিদিন দেরী করে আসিস?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকা ছাত্রটা প্রথমে কিছু বলতে না চাইলেও, মারের ভয়ে বললো,

–আমার ছোট ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে দেরী হয়ে যায়। সে সকালের স্কুল থেকে ফিরলে, তার জামা পরে বিকেলের স্কুলে আসি।

জীবন জাগার গল্প : ৪৩২

আই লাভ ইউ

দাদা বিকেল বেলা বাড়ির দক্ষিণ পাশের বাগানে বসে আছেন। যিকির করছেন বসে বসে। মুখে স্মিত হাসি লেগে আছে। চোখ দু'টি বন্ধ।

দাদাকে একা দেখে বড় নাতনি পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। একটা চেয়ার টেনে দাদাভাইয়ের পাশে বসল। দাদাভাই চোখ না খুলেই বললেন,

–নিশ্চয়ই কোনও সমস্যা দেখা দিয়েছে। না হলে তো এই বুড়ো খোকার কাছে কেউ আসে না। শুধু আদর-আব্দার প্রয়োজন হলেই মনে পড়ে।

তা কী এমন সমস্যা, সবাইকে লুকিয়ে একা একা আসতে হলো? একি, চোখে পানিও দেখছি। ভাবগতিক তো সুবিধের মনে হচ্ছে না! তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেল। কেউ দেখে ফেললে সাফাই গাইতে গাইতে আমাকে জেরবার হতে হবে। হ্যাঁ এবার বলো।

–দাদা ভাই! আমি একজনকে ভালোবেসে ফেলেছি। তাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।

–এই রে, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই দেখছি। তা তলে তলে ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে না অপর পক্ষেরও সাড়া মিলেছে?

–জি, সেও আমাকে ভালোবাসে।

–সে কি পরিষ্কার করে তোমাকে তার ভালোবাসার কথা বলেছে?

–জি না, সেভাবে কখনো বলেনি সত্য। তবে তার আচরণ দেখে আমার তাই মনে হয়।

–আচ্ছা তা না হয় বুঝলাম। তবুও আরেকটু যাচাই করে নেয়া ভাল। তুমি আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক দাও দেখি!

তুমি যদি ক্ষুধার্ত থাকো তাহলে কী করো?

–ঘরে খাবার খুঁজি। ফ্রিজ খুলে দেখি!

–অনেক খুঁজেও যদি ঘরে খাবার না পাও তাহলে?

–দোকানে গিয়ে খাবার কিনে আনি।

–আর যদি তুমি ক্ষুধার্ত না হও, তখনও কি খাবার খুঁজতে বাইরে যাও?

–ক্ষুধা না থাকলে শুধু শুধু কেন খাবার খুঁজতে যাবো!

–এবার দেখো, তুমি যদি নিছক তার খাবার হও, তাহলে নিজেকে তার থেকে আড়ালে রাখো। সেই তোমাকে খুঁজে বের করবে।

যদি না খোঁজে তাহলে ধরে নেবে সে তোমার ভালোবাসার জন্যে ক্ষুধার্ত নয়। এটা তার নতুন যৌবনের রঙিন ফানুস। তোমাকে কয়েকদিন না দেখলেই আরেকজনকে খুঁজে নেবে।

জীবন জাগার গল্প : ৪৩৩

বুড়োর দুঃস্বপ্ন!

লোকটার কাজই হলো পরচর্চা করা। চা দোকানে, পাড়ার কোণের বেঞ্চিতে বসে, মহল্লার ক্লাবে। কোনও জায়গাই বাদ নেই। কাউকে সামনে পেলেই হলো, সাথে সাথে শুরু হয়ে যাবে পরনিন্দা। গীবত।

মানুষ অতিষ্ঠ। রাস্তা দিয়ে তাকে হেঁটে আসতে দেখলেই হয়েছে, তড়িঘড়ি সটকে পড়ে সবাই। তার সামনে পড়লেই হয়েছে, একটা না একটা দোষ বের করে, সেটার রসালো বর্ণনা দিবে পরে কখনো। পারতপক্ষে কেউ তার ছায়াও মাড়াতে চায় না।

এক রাতে বুড়োটা স্বপ্নে দেখলো।

=বিরাট এক ভয়ংকর দৈত্য, তার টুটি চেপে ধরেছে। প্রখর ধারালো নখর দিয়ে তার জিহ্বাকে টুকরো টুকরো করে ছিটিয়ে দিচ্ছে। জিহ্বাটা কাটাকুটি শেষ হলেই, আবার আগের মতো ভাল হয়ে যাচ্ছে। দৈত্যটাও আবার জিভটা খুবলে নিয়ে, নখ দিয়ে কুটতে শুরু করছে।

বিকট এক আর্তচীৎকার করে বুড়ো ঘুম থেকে জেগে উঠলো। বাকি রাত আর ঘুম এলো না। পরপর তিন দিন স্বপ্নটা দেখলো।

.

সকালে কালবিলম্ব না করে দৌড়ে ইমাম সাহেবের কাছে গেলো।

–হুযুর আমি ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন! রাতে ঘুমুতে পারি না। দিনে স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া করতে পারি না। মরে যাওয়ার অবস্থা!

–বিপদটা কী?

বুড়ো তার স্বপ্নের কথা খুলে বললো। হুযুর বললেন,

–আপনি কি নিয়মিত বড় ধরনের কোনও গুনাহ করেন?

–না তো! এ-বুড়ো বয়েসে কি গুনাহ করার শক্তি-তাকদ আছে শইলে?

–তাহলে? এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। অন্যে কষ্ট পায়, এমন কিছু করেন না?

–না, তেমন কিছু তো মনে পড়ে না। তবে আমার চোখে সবসময় মানুষের দোষগুলো ধরা পড়ে!

–সেগুলো কি অন্যের কাছে বলে বেড়ান?

–জি।

–এটাই সে বড় পাপ।

–এটা পাপ হবে কেন?

–অন্য পাপ তো আল্লাহ চাইলেই ক্ষমা করবেন। এটা এমন পাপ, যার ক্ষমা পাওয়াও বেজায় কঠিন। ঠিক আছে, বিষয়টা আপনাকে বোঝাচ্ছি। বাড়িতে বালিশ আছে না?

–আছে।

–একটা বালিশ নিয়ে ছাদে উঠবেন। ছুরি দিয়ে বালিশটা কেটে, তুলাগুলো বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে আবার আসবেন।

–হুযুর উড়িয়েছি।

–ঠিক আছে, আবার গিয়ে তুলাগুলো কুড়িয়ে বালিশে ঢুকিয়ে আসুন।

–হুযুর! এটা কী করে সম্ভব? তুলাগুলো বাতাসে কোথায় কোথায় চলে গেছে, তার কোনও হদিস আছে?

–আপনর গীবতের পরিণামও এমনি। গতজীবনে কার কার গীবত করেছেন, তার কোনও লেখাজোখা নেই। আপনি সবার কাছে ক্ষমা চাইতে পারবেন? সবাই তুলার মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েনি?

–হুযুর এ পাপ থেকে বাঁচার উপায়?

–যখনই আপনার গীবত করার ইচ্ছে হবে কল্পনা করবেন, মরা ভাইয়ের কবরে নেমেছেন। সামনে ভাইয়ের গলিত ভকভকে পঁচা লাশ। আপনি স্বপ্নে দেখা সেই পিশাচের মতো, খুবলে খুবলে বনবনে মাংস খাচ্ছেন। তাহলেই গীবতের রুচি থাকবে না।

–কিন্তু অতীতে যা করেছি?

–যাদেরকে চেনেন, তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন।

–কিন্তু অনেককে তো চিনি না। বা তারা মারা গেছে, নয়ত এখন কাছেপিঠে থাকে না!

–তাদের জন্যে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন। পারলে তাদের জন্যে আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা করবেন! এতে হয়তো আপনার পাপ কাটাকুটি হয়ে যেতে পারে। যদি আল্লাহ চান।

জীবন জাগার গল্প : ৪৩৪

বন্দুকের নল

রাশিয়া ঝাঁপিয়ে পড়েছে ককেশাশ অঞ্চলের নিরস্ত্র মুসলমানদের ওপর। মুজাহিদ বাহিনীও জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে লালরুশের বিরুদ্ধে। নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে রাশান সজোঁয়া যানে করে আসা লালমুখোগুলোকে।

.

দুর্গম এলাকায় পোস্টিংয়ে থাকা রুশ জেনারেল ইউরি বালোভস্কিকে সাংবাদিক প্রশ্ন করলো,

–আপনাদের এত ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র দিয়েও প্রায় খালি হাতে লড়াই করা একদল নিরন্ন-ভুখা নাঙ্গা 'প্রলেতারিয়েতকে' নির্মূল করতে পারছেন না কেন?

–সের্গেই! তুমি সাংবাদিক মানুষ, শিক্ষিত মানুষ, বিভিন্ন যুদ্ধফ্রন্টে সংবাদ কাভার করার দুর্লভ অভিজ্ঞতা তোমার আছে। আচ্ছা তুমিই বলো,

= প্রতিপক্ষের দিকে তাক করা বন্দুকের নল দিয়ে যারা শত্রুকে দেখে না, দেখে তাদের হুর-গেলমানপূর্ণ জান্নাত। এমন একটা দলকে কি কারো পক্ষে হারানো সম্ভব?

জীবন জাগার গল্প : ৪৩৫

ফাঁস!

যোহরের নামায শেষ হয়েছে। মুসল্লীরা সুন্নাতের জন্যে দাঁড়াবে। মাইক্রোফোন হাতে মহল্লার একজন মুরুব্বি, মসজিদের সভাপতি সাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন।

–উপস্থিত হাযেরানে মজলিস! সম্মানিত মুসল্লী ভাইয়েরা! আজ আমাদের অত্যন্ত আনন্দের দিন। এই আমার সামনে বসা ভাইটাকে দেখছেন, সে তাওবা করে নতুন জীবন শুরু করেছে।

সে আগে করতো না এমন কোনও পাপ নেই। চুরি-ডাকাতি, রাহাযানি-খুনখারাবি। মদ-জুয়া-নারী সব।

আল হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তাকে তওবার তাওফীক দিয়েছেন। হিদায়াত নসীব করেছেন।

এই খোকন মিয়া! উঠে আস। সবাইকে সালাম দিয়ে দু'আ চাও। তোমার কাযগুযারী শোনাও।

খোকন মিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে এল। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বললো,

–আমার আসলে বলার কিছু নেই। সভাপতি সাহেবই তো সব বলে দিয়েছেন। বলতে কিছুই বাকী রাখেননি।

আমি সব গুনাহের সাথেই লিপ্ত ছিলাম। মা যাহারা মিনহা ওমা বাতান (প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য)। আমি তাবলীগেও সময় লাগিয়েছি। দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো শিখেছি। দু'আ-দুরূদ শিখেছি। দাওয়াত দিতে শিখেছি। আল্লাহর রহমতে আরও কিছু বিষয়ও আমাদের আমীর সাহেবের কাছ থেকে শিখেছি। আমি তার পরামর্শে যে যত অন্যায় করেছি, তার ক্ষতিপূরণ দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

তবে একটা বিষয় আমার কাছে খটকা লাগে। আমি এত বছর ধরে গুনাহ করে এসেছি, কিন্তু আল্লাহ কখনো সবার সামনে আমার অপরাধ প্রকাশ করেননি। আমাকে অপদস্থ করেননি। অসম্মানিত করেননি।

কিন্তু সভাপতি সাহেবের সাথে পরিচিত হলাম। তারপর থেকেই আমার অপদস্থ হওয়ার পালা শুরু হয়েছে। তিনি প্রতিদিন একটা মসজিদে নিয়ে হাযির করেন, আর আমার অতীত জীবনের নানা কুকীর্তির ফিরিস্তি তুলে ধরেন।

আল্লাহ যে কাজ করেননি, বান্দাই সে কাজ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে!

জীবন জাগার গল্প : ৪৩৬

বেগুনবিবি

শায়খ আলী তানতাভী (রহ.) লিখেছেন,

–দিমাশকে একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল। নাম মসজিদে তাওবা।

বর্তমান মসজিদের স্থানে আগে একসময় ছিল একটা 'রঙ্গালয়'। সব ধরনের পাপাচার এখানে সংগঠিত হতো। হিজরী সপ্তম শতকে একজন শাসক জায়গাসমেত রঙ্গালয়টা কিনে নিলেন। পুরনো অবকাঠামো ধ্বসিয়ে নতুন করে একটা সুন্দর ভবন নির্মান করলেন। কাজ শেষ হলে সুরম্য ভবনটাকে মসজিদ হিশেবে জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করে দিলেন। তখন থেকেই মসজিদে তাওবা নামে লোকমুখে পরিচিত পেয়ে গেছে।

মসজিদে তাওবায় একজন শায়খ থাকতেন। সলীম সুয়ূতী। ইলমে-আমলে তুলনারহিত। আশেপাশের দশ-বিশ গ্রামের মানুষ শায়খের মুরীদ। সবার আস্থার পাত্র। ভরসাস্থল। দ্বীনি ও দুনিয়াবি সব বিষয়ে তারা শায়খের শরণাপন্ন হয়। তার পরামর্শ মতোই চলে।

শায়খ মসজিদের পাশে একটা মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখান থেকে ইলমপিপাসু ছাত্ররা তাদের তৃষ্ণা মেটাতো।

মাদরাসায় ভিনদেশী একজন গরীব ছাত্র ছিল। অতুলনীয় মেধার অধিকারী। তাকওয়া-পরহেযগারীতে তার ধারেকাছেও কেউ ছিল না। সবসময়

মাদরাসায় মাটি কামড়ে পড়ে থেকে সাধনা-মুজাহাদায় মশগুল থাকতো। শত কষ্টেও কারো কাছে হাত পাততো না। নিজের অভাব অনটনের কথা কাউকে বলতো না। এমনকি শায়খের কাছেও নিজের দারিদ্র্যের কথা ভাঙতো না। বড়ই টনটনে তার আত্মমর্যাদাবোধ।

মাদরাসা ছুটি হলো। ছাত্ররা যে যার বাড়ি চলে গেল। শায়খও নিজের কাজে ব্যস্ত থাকেন। ছাত্রটির যাওয়ার মতো কোনও জায়গা না থাকায়, মাদরাসাতেই রয়ে গেল।

তার কাছে খাবার কেনার মতো একটা কানাকড়ি-পাই পয়সাও অবশিষ্ট ছিল না। এদিকে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির অবস্থা। এভাবে একদিন গেল, দেখতে দেখতে দ্বিতীয় দিনও চলে গেল। ধুঁকে ধুঁকে তৃতীয় দিনে গিয়ে পড়লো। আর তো হাত চলে না। ছাত্রটি দেখলো সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। কারো কাছে কিছু চাইবে তাতেও মন সায় দিচ্ছিল না। লজ্জা, সংকোচ বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। শেষে ঠিক করলো লোকচক্ষুর অন্তরালে চুরি করবে। পরে আবার গোপনে শোধ করে দিবে। তার এখন যা (ইযতিরারী) অবস্থা তাতে প্রাণরক্ষা-পরিমাণ মৃত জন্তুর মাংস খাওয়া বা চুরি করা তো বৈধ। ভেবেচিন্তে ঠিক করলো চুরি করবে।

শায়খ তানতাভী লিখেছেন, ঘটনাটা পুরোপুরি সত্য। আমি ঘটনার সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে ভালো করে চিনি। ভালোমন্দ, ঠিক-বেঠিক, জায়েয-না জায়েযের বিচারে না গিয়েই শুধু যা ঘটেছে সেটাই বলে যাচ্ছি। ।

মসজিদটি ছিল শহরের প্রাচীন অংশে। পুরান শহরে যেমনটা হয় আরকি, একটা ঘরের সাথে আরেকটা ঘর পুরোপুরি লাগোয়া। এক বাড়ির ছাদে উঠলে পুরো মহল্লায় ছাদে ছাদেই একটা চক্কর দিয়ে আসা যায়।

ছাত্রটা রাতের বেলায় মসজিদের ছাদে উঠে গেল। লাফ দিয়ে পাশের বাড়ির ছাদে গেল। গরমকাল ছিল, উঠোনে কয়েক নারী পাটি বিছিয়ে শুয়ে আছে। তাড়াতাড়ি দৃষ্টি অবনত করে পরের বাড়ির ছাদে চলে গেল। নিচ থেকে খাবারের সুঘ্রাণ এসে নাকে লাগলো। ঘ্রাণটা ছাত্রটিকে চুম্বকের মতো টেনে নিচে নামিয়ে আনল। সে একটা ঘোরের মধ্যে ঘ্রাণের উৎসের দিকে হেঁটে চলল। হাঁড়ির ঢাকনা উঠিয়ে দেখল চমৎকার করে বেগুন রান্না করে রাখা আছে। এখন শুধু মুখে তুলে খাওয়ার দেরী।

একটুকরা বেগুন উঠিয়ে নিল। আচ্ছন্নের মতো কামড় বসিয়ে দিল। প্রচণ্ড গরম হওয়ার কারণে সামান্য একটু মুখে দিতে পেরেছিল। সেটুকুই চিবিয়ে গলাধ:করণ করতে গিয়েই হুঁশ ফিরে এলো।

–করছি কী আমি? চুরি করে হারাম খাচ্ছি? আমি না তালিবে ইলম?

.

সম্বিত ফিরে পেয়ে হাতে নেয়া আধকামড়ানো বেগুনটা ডেগে রেখে দিল। বেরিয়ে এলো।

এরপর ভাবলো খাবার খেতে যেহেতু মনে সায় দিচ্ছে না, কিছু একটা চুরি করে নিয়ে যাই, পরে ফেরত দিয়ে দেব। কিন্তু এই চিন্তাও মাথায় ঠাঁই পেল না।

.

মসজিদে ফিরে এল। কষ্টেসৃষ্টে বাকি রাতটুকু কাবার করলো। ফজরের পর চোখে সর্ষেফুলের ফুটকি নিয়ে শায়খের দরসে বসলো। দরস শেষ হওয়ার পর আর নড়াচড়া করার শক্তি নেই। অবসন্ন শরীর চেতনা-অবচেতনার মাঝামাঝি একটা অবস্থায় পৌছে গেছে। চলচ্ছক্তিরহিত।

অন্য ছাত্ররা যে যার মতো চলে গেছে। শায়খ এখনো বসে আছেন। একজন আপাদশির ঢাকা মহিলা এল। তখনকার দিমাশকে সব মহিলাই পুরো শরীর ঢেকে ঘরের বাইরে বের হতো। ফরাসীদের মেমদের দেখাদেখি, এখনকার মতো অর্ধনগ্ন হয়ে বের হওয়া মেয়েদের মতো কাউকে তখন কল্পনাও করা যেত না।

মহিলা সোজা শায়খের কাছে গিয়ে বললো,

–আমি দূর দামেশকে নতুন এসেছিলাম। স্বামীর সাথে। এখানেই থাকবো বলে। একটা বাড়িও কেনা হয়েছে। গত কিছুদিন ধরে আমরা কেনা বাড়িতেই থাকছিলাম।

–দিমাশকে কেন থাকতে এলে?

–স্বামীর চিকিৎসার জন্যে।

–স্বামী কোথায় এখন?

–সেটা বলতেই এখানে এসেছি। সবাই আপনর কথা বললো। গত কয়েক মাস আগে আমার স্বামী মারা গেছেন। ইদ্দত শেষ হওয়ার অপেক্ষায় ঘরে বসে ছিলাম। আমার সাথে আমার অতি বৃদ্ধ নিঃসন্তান চাচাও থাকেন। আজ !কে সাথে করেই এখানে এসেছি।

–তো মা, আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি? আমার কাছে কেন এসেছ?

–আমি তো এখন একা একা থাকি। আমার বয়েসও বেশি হয়নি। স্বামীর সাথে সংসারও বছরখানেকের বেশি নয়। স্বামীহারা একজন যুবতী মেয়ের প্রতি অনেকেরই চোখ টাটায়। তায় আমার স্বামী বিপুল পরিমাণ সম্পদ রেখে গেছেন।

বাড়িতে পাড়াতুতো নানা ধরনের উটকো ভাই-বেরাদর, জ্ঞাতি-গোষ্ঠি, নাসাবান-সিহরান দেখা দিয়েছে। তাদের মাছের মায়ের কান্নায় তোড়ে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে বাড়িতে অবস্থান।

–কেমন পাত্র চাও তুমি?

–আমার কেমন স্বামী প্রয়োজন সেটা আপনি ভালো করেই বুঝবেন। শুধু এটুকু বলবো, দ্বীনদার হলেই হবে।

শায়খ তাকিয়ে দেখলেন মসজিদের কোণে একজন ছাত্র চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। জোরে হাঁক পাড়লেন। কাছে এলে কোনও ভূমিকা-ভণিতা ছাড়াই জিজ্ঞেস করলেন,

–তুমি বিয়ে করেছ?

–জি না।

–এখন বিয়ে করতে রাজি আছ?

–আমার তো এখন রুটি কেনারও টাকা নেই, মোহরানা আদায় কিভাবে করবো?

–তার ব্যবস্থা হয়ে যাবেখন।

–আমি রাজি।

–এবার মা তুমি বলো, একে তোমার স্বামী হিশেবে পছন্দ হয়?

–জি।

দু'জন স্বাক্ষী ডেকে সাথে সাথে বিয়ে পড়িয়ে দেয়া হলো। নববধু বিয়ে করা স্বামী নিয়ে, বৃদ্ধ চাচাসহ ঘরে ফিরে এলো।

এত তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাবে ধারণা ছিল না। তেমন হলে বাড়তি রান্নাবান্নার যোগাড়যন্ত্র করে রাখতো। এখন ঘরে যা আছে তাই হাজির করলো। প্লেটে রুটি দিল। তরকারির ডেগের ঢাকা উল্টিয়ে হায় হায় করে উঠলো,

–আশ্চর্য! বেড়াল কখন বেগুনে মুখ দিল?

জামাই সাথে সাথে বুঝে ফেলল ঘটনা কী? লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে সব খুলে বললো। সব শুনে বৃদ্ধ চাচা বললেন,

-এটা হলো আমানতের ফল্ তুমি হারাম বেগুন থেকে বিরত থেকেছ। আল্লাহ তা'আলা বিনিময়ে পুরো বেগুনের মালিককেই তোমাকে দিয়েছেন।

-জি চাচাজান! বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কিছু ত্যাগ করলে, তিনি বান্দাকে তার চেয়ে উত্তম কিছু দান করেন। শায়খ কথাটা আমাকে প্রায়ই বলতেন। তখন বুঝতাম না, তিনি আমাকেই কেন কথাটা বারবার বলতেন। তার কথা শুনে শুনে আমারও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল কথাটার প্রতি। কিন্তু সেটার প্রতিফলন যে এত সুন্দর পরিণতি আর এমন অপূর্ব সুন্দর মানুষ দিয়ে ঘটবে কস্মিনকালে-ঘূর্ণাক্ষরেও ভাবিনি।

জীবন জাগার গল্প : ৪৩৭

শয়তানের সাহায্য

এক গরীব মহিলা এফএম রেডিওতে মেসেজ পাঠাল।

-আমি অত্যন্ত গরীব। থাকা-খাওয়া নিয়ে খুবই কষ্টে আছি। কোন জনদরদী ভাই-বোন যদি আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য করেন!

.

আর. জে. অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে মেসেজটা পড়ে শুনিয়ে দিল। এক নাস্তিক মেসেজটা শুনে, তার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল।

প্রয়োজনীয় সাহায্য ও কিছু টাকা দিয়ে তার এক সেক্রেটারিকে পাঠাল। বিদায় দেয়ার সময় বলে দিল,

-মহিলা যদি জিজ্ঞেস করে কে পাঠিয়েছে এ সাহায্য? তুমি বলবে শয়তান পাঠিয়েছে।

.

সেক্রেটারি ঠিকানা মিলিয়ে ঘরে এল। মহিলাকে ত্রাণসামগ্রী আর নগদ টাকা দিল। বুড়ি সাহায্যগুলো নিল। কিন্তু কে পাঠিয়েছে, কী আষয়-বিষয় কিছুই জানতে চাইলো না।

সেক্রেটারি থাকতে না পেরে বলেই ফেললো,

-কে পাঠাল জানতে চাইলেন না যে?

–আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছি। এবার তিনি সাহায্যটা যেকোন ভাবেই করতে পারেন। এমনকি শয়তানকে দিয়েও করাতে পারেন। সেটা জেনে আমার কী লাভ? আমি চেয়েছি, তিনি দিয়েছেন, ব্যস।

জীবন জাগার গল্প : ৪৩৮

ডিজিটাল অভিশাপ

একটা বিরাট হলঘরে জমজমাট অনুষ্ঠান চলছে। বড়লোকদের আসর। একজন গরীব মানুষও কিভাবে যেন ময়ূরের দেশে কাক হয়ে ঢুকে পড়লো।

.

বেচারার পোশাকাশাক দেখে অন্যরা টের পেয়ে গেলো। শুরু হলো টিটকারী। ঠাট্টা-তামাশা। গরীব বেচারা আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললো,

–দেখুন, আমি গরীব বলে উপহাস করছেন। আল্লাহর ইচ্ছাতেই তো আমি গরীব আর আপনারা ধনী।

.

আল্লাহ চাইলে এখুনি আপনাদেরকে অন্ধ করে দিতে পারেন। ল্যাংড়া করে দিতে পারেন। আপনাদের সম্পদ কেড়ে নিতে পারেন। এভাবে উপহাস করা ঠিক নয়।

.

লোকটা তার কথা শেষ করতে না করতেই সবাই তার পায়ের ওপর এসে লুটিয়ে পড়লো।

–বাবাজি! আমাদের ভুল হয়ে গেছে। এবারের মতো মাফ করে দিন। আপনার অভিশাপ তুলে নিন। আপনি যা চান তাই দেব।

–আমি আবার অভিশাপ দিলেম কোথায়?

–এই যে আমরা অন্ধ হয়ে গেছি! চোখে দেখতে পাচ্ছি না!

–আরে বুদ্ধুর দল! আমার পা ছেড়ে আগে একজন গিয়ে জেনারেটরটা ছেড়ে দিন। বিদ্যুত চলে গেছে। আমারও একই অবস্থা।

জীবন জাগার গল্প : ৪৩৯

সন্তানের অভিনয়

হাসপাতালের ঠিক সামনেই মর্মান্তিক এক গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটলো। একটু গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, পাগলা গতিতে ছুটে এসে ফুটপাতে দ ড়িয়ে থাকা বৃদ্ধকে আঘাত করলো। মুমূর্ষ অবস্থায় বৃদ্ধকে হাসপাতালে আনা হলো।

.

প্রাথমিক ব্যবস্থা নেয়ার পর, বৃদ্ধের বাড়িতে খবর দিতে গিয়ে দেখা গেল বৃদ্ধ ঠিকানা বলতে পারছে না। পকেট হাতড়ে দেখা গেল একটা মানিব্যাগ আছে। সেখানে একটা ঠিকানা লেখা।

.

সে ঠিকানায় যোগাযোগ করে বলা হলো।

–আপনার বাবার অবস্থা গুরুতর। আপনি তাড়াতাড়ি হাসপাতালে হাজির হোন। ঘন্টা দুয়েক পর দেখা গেল, দেশের বিমান বাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যাজধারী একজন অফিসার এলেন।

.

কর্তব্যরত নার্স বৃদ্ধের কানের কাছে গিয়ে বললো:

–আপনার ছেলে এসেছে।

.

কথাটা শোনার সাথে সাথেই বৃদ্ধের শরীরে যেন বিদ্যুত খেলে গেল। দু'হাত বাড়িয়ে সন্তানকে ছুঁতে চাইল। উঠে বসতে গিয়ে আবার নেতিয়ে পড়লো। অফিসার সন্তান ছুটে গিয়ে বৃদ্ধের হাত জড়িয়ে ধরল। আরেক হাত দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

.

ডাক্তার-নার্সদের শত ছোটাছুটি সত্ত্বেও বৃদ্ধের অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছিল। অফিসার ছেলে সেই যে এসে বাবার শিয়রে বসেছে, আর ওঠাউঠির নামটিও মুখে আনেনি। ঠায় বসে আছে।

.

-আপনি অন্তত একটু হলেও হেঁটে আসুন! না হলে তো আপনিও অসুস্থ হয়ে পড়বেন। অবাক হয়ে নার্স বললো।

অফিসার কোন কথায় কান দিল না। আগের মতোই বৃদ্ধের পাশে পাশে রইল। শেষ রাতের দিকে বৃদ্ধ মারা গেল।

.

নার্স লাশকে মর্গে নেয়ার সময় পরম ভক্তিশ্রদ্ধার সাথে বললো,

–ধন্যি পিতা! আপনার মতো একজন পিতৃভক্ত সন্তান পেয়েছেন।

–আপনি যা ভাবছেন, তা সঠিক নয়। এই বৃদ্ধ আমার পিতা নন।

–তাহলে এতকিছু, এত কষ্ট স্বীকার, রাতজাগা, ঠায় বসে থাকা!

–আমি যখন কেবিনে এলাম, বৃদ্ধকে আপনি বলেছিলেন, 'আপনার ছেলে এসেছে।' তখন বৃদ্ধের চোখ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম তিনি অন্ধ। কিন্তু ছেলের আগমনী সংবাদ শুনে তার চোখেমুখে আনন্দের যে আভা ফুটে উঠতে দেখেছিলাম তা আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। বুঝতে পেরেছিলাম, বৃদ্ধের শেষ সময় উপস্থিত। বৃদ্ধ সন্তানের জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষায় আছেন। কথা বলতে পারছেন না বিধায় বোঝাতে পারছেন না।

আমি তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, যত কষ্টই হোক একজন মৃত্যুপথযাত্রী পিতার শেষ সময়টা আনন্দে কাটানোর জন্যে, যত কিছু করতে হয়, আমি করে যাবো। চাকুরির পরোয়া করবো না।

জীবন জাগার গল্প : ৪৪০

মায়ের ফুল

ডাবলিন। আয়ারল্যান্ডের রাজধানী। তরুণ শিল্পপতি গাড়ি থেকে নামলো। মায়ের জন্যে কিছু খরচাপাতি কিনবে। মা থাকেন চারশ কিলোমিটার দূরের এক গ্রামে। প্রতি সপ্তাহে একবার করে মায়ের কাছে যায়। কিন্তু গত দু'সপ্তাহ যাওয়া হচ্ছে না। এর আগেও কয়েকবার বাদ পড়েছে। ফ্লোরার সাথে বিয়ে হবার পর মায়ের ঠিকমতো খোঁজ-খবর রাখা হচ্ছে না। অপরাধবোধ পেয়ে বসল তরুণ শিল্পপতিকে।

.

আজ যেভাবেই হোক যাবেই মায়ের কাছে। পাশের দোকান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি কিনল। গাড়িতে উঠেই মনে হলো, আজ দেরী হয়ে গেছে। আরও সকাল সকাল রওয়ানা দেয়ার দরকার ছিল। আজ থাক, আগামীকাল যাব।

গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তার ওপাশের লেনে যেতেই চোখ পড়ল একটা কিশোরীর ওপর। কাঁদছে। কালো। পরনের পোশাকেও দারিদ্রের ছাপ। এমন দৃশ্য ডাবলিনে বিরল নয়। কিন্তু আজ কেন যেন দৃশ্যটা বেশ রেখাপাত করলো। করে গাড়িটা একপাশে থামালো।

–তুমি কাঁদছো কেন?

–আমি একটা লাল গোলাপ কিনতে চাই। আমার কাছে টাকা নেই।

–লাল গোলাপ কেন?

–আমার মায়ের জন্যে।

–ঠিক আছে, এসো আমিই আজ তোমাকে আজ লালগোলাপ কিনে দেব।

.

–তোমার আম্মু কোথায় থাকেন?

–ওই তো টমসন স্ট্রীটের গীর্জার পাশে।

–চলো তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসি।

.

তরুণ গন্তব্যে গিয়ে কিশোরীর সাথে গাড়ি থেকে নামলো।

–তুমি ফুলটা তোমার মাকে দিয়ে এসো। আমি অপেক্ষা করছি। আর শোন তোমার মাকেও নিয়ে এসো। আমি গাড়ির কাছেই থাকি।

–আম্মু তো আসতে পারবেন না!

–কেন?

–তিনি তো সেমিট্রিতে। মারা গেছেন।

–ও তুমি কবরে ফুল দিতে চাচ্ছিলে।

–হ্যাঁ, প্রতি রোববারে আমি আম্মুর কবরে ফুল দিই। এটা তো গণকবর। মায়ের কবর আলাদা করে চেনা যায় না। তবুও আন্দাজে একটা কবরে ফুল দিয়ে আসি। আমার আম্মু লালগোলাপ খুব ভালোবাসতেন।

.

তরুণ শিল্পপতির মনে তখন ঝড়। কোনওমতে পকেট হাতড়ে কিছু টাকা বের করে কিশোরীকে দিয়ে বললো,

–এগুলো রাখো। আর এই নাম্বারে সুযোগ মতো কাল-পরশুর দিকে ফোন করো।

.

এখন আর তার কাছে চারশ কিলোমিটার কোনও দূরত্বই মনে হচ্ছে না। চার হাজার কিলোমিটার হলেও পরোয়া ছিল না।

গাড়ি চলছে শাঁ শাঁ করে।

সিজলীনের দিকে।

ফেলে আসা শৈশবের দিকে।

ছেলের পথ চেয়ে থাকা একটা বিধবা মায়ের দিক।

চোখে ছানি পড়া এক বৃদ্ধের দিকে।

জীবন জাগার গল্প : ৪৪১

ভালোর মানদণ্ড

বছর শেষ। ছাত্ররা যে যার বাড়িতে চলে যাবে। শায়খ একজন একজন করে ডেকে ডেকে খোঁজ নিচ্ছেন। কার কী অবস্থা। কার কতদূর উন্নতি হলো। প্রথম ছাত্র শায়খের কাছে গেল,

– আল্লাহর সাথে তোমার কেমন সম্পর্ক হয়েছে?

–অন্যদের তুলনায় ভাল হযরত!

–অন্যদের তুলনায় ভাল মানে? আবু বকর-উমর (রা.)-এর চেয়ে ভাল বলছো?

–জি না। তাদের কথা বলিনি।

–তবে কাদের কথা বলেছ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর চেয়ে ভাল বলছো?

–না না, শায়খ, আমি সাহাবাদের কথা বলিনি।

–তবে কার কথা বলেছ, হাসান বসরী? সায়ীদ ইবনে মুসাইয়াব?

–না শায়খ! তাদের কথা ভেবেও বলিনি। কোথায় তারা আর কোথায় আমি?

–তো?

–আমি বলেছি, এই ধরেন গায়ক, নর্তক, চোর-ডাকাতদের কথা ভেবে!

–ও তুমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্যে সাহাবা-তাবেয়ীদের ছেড়ে, গায়ক-নর্তকদেরকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছ?

তাদের সাথে মিলিয়ে তুমি তোমার ধার্মিকতা মাপছো? ধিক, তোমার মানদণ্ড। তারা যত খারাপ হবে, তোমার মানদণ্ডও তত খারাপ হতে থাকবে। অথচ তোমার মানদণ্ড হওয়ার কথা ছিল সাহাবা-তাবেয়ীনগণ।

জীবন জাগার গল্প : ৪৪২

বিচিত্র প্রেম!

রাজার একটাই মেয়ে। জ্ঞানে-গুণে অনন্যা। বিদ্যা-বুদ্ধিতে নিপুণা। ধর্মে-কর্মে সুশীলা। দান-খয়রাতের প্রতি বেশ ঝোঁক। তার কাছে এসে কেউ খালি হাতে ফেরে না। কাছেপিঠের মানুষ তার আদব-লেহাযের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

রাজকন্যার অনেক দিনের ইচ্ছা, সম্পূর্ণ নিজখরচে একটা মসজিদ নির্মাণ করবেন। এমনকি রাজার কাছ থেকেও কোনও সাহায্য নেয়া হবে না। নিজের একটা বহুমূল্য হীরার হার ছিলো। সেটা বিক্রি করে দিলেন। সাথে ছিল মরহুম মায়ের দেয়া অলংকারাদি। নানির দেয়া কিছু স্বর্ণও ছিল। সবমিলিয়ে টাকা মন্দ হলো না।

.

শুরু হলো মসজিদের কাজ। রাজ্যের দক্ষ করিগররা লেগে গেলো। ভিনদেশ থেকেও ওস্তাদ মিস্ত্রিরা এলো। হৈ হৈ করে ভিত দাঁড়ালো। দেয়াল উঠলো। ছাদ দেয়া বাকি। রাজকন্যার খায়েশ হলো, কাজের অগ্রগতি নিজের চোখে একবার দেখবে।

.

সবাইকে সরিয়ে দেয়া হলো। পরিপূর্ণ পর্দাঘেরা ব্যবস্থায় 'সাইটে' এলেন। সাথে সই-সখীরাও আছে। কোনও পুরুষ নেই দেখে, মুখের নেকাব আলগা করলো সবাই।

.

মসজিদের মিনারের কাজ চলছিল। উপরে এক জোগালি কাজ করছিল। তাকে কেউ নামতে বলেনি। সে কাজ শেষ করে নামতে গিয়ে দেখে নির্মাণাধীন মসজিদে একঝাঁক হুর-পরী ঘুরছে। তাদের মধ্যমণি একজনকে দেখে জোগালি মাথা ঘুরে গেলো। এত সুন্দর মানুষও হতে পারে? ইনিই কি রাজকন্যা?

.

জোগালির মনে শুরু হলো তুফান। মেঘ না চাইতেই ঘূর্ণিঝড়। এক দেখাতেই সে রাজকন্যার প্রেমে দিওয়ানা হয়ে গেলো। লুকিয়ে লুকিয়ে যত পারা যায়, রূপসুধা পান করলো। বিকেলে উদ্ভ্রান্তের মতো বাড়ি গেলো। বৃদ্ধা মা ছেলের

অবস্থা দেখে হায় হায় করে উঠলেন,

–বাবা, তোর এ অবস্থা কেন? কী হয়েছে, পড়ে টড়ে যাসনি তো?

–নাহ মা, শরীর ঠিক আছে!

–তবে?

.

মায়ের জোরাজুরিতে ছেলে মুখ খুলতে বাধ্য হলো।

–মা আমি আজ রাজকন্যাকে দেখেছি।

–সে তো আমিও দেখেছি!

–আরে সে দেখা নয়। আমি তাকে ছাড়া আর বাঁচবো না।

–ওরে বাবা! এক দেখাতেই এ-অবস্থা!

–তাকে বিয়ে করতে না পারলে আমি নির্ঘাত মরে যাবো।

–কীসব আবোল-তাবোল পাগলের প্রলাপ বকছিস! তুই কোথায় আর উনি কোথায়, সে খবর আছে?

–সেটা আমিও জানি ও বুঝি। সেজন্যই তো এত হাহাকার! তাকে না দেখে আমি বেঁচে থাকতে পারবো না!

–আচ্ছা ঠিক আছে। তুই এখন খেয়েদেয়ে ঘুমা। আগামীকাল দেখা যাবে।

.

পরদিন বৃদ্ধা মা চেষ্টা-তদবির করে রাজপ্রাসাদে গেলেন। রাজকন্যার সাথে দেখা করা সহজ। তিনি সবার সাথে দেখা করেন। নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকলেই হলো। তখন তিনি গরীব-দুঃখীর কথা শোনেন। নিজে যতটুকু পারেন করেন, সাধ্যাতীত হলে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেন।

.

বুড়ি এক কোণে বসে রইল। সবাই যে যার আর্জি পেশ করে চলে গেলো। রাজকন্যার চোখ পড়লো।

–কী আপনি বসে আছেন যে, কিছু বলার থাকলে বলুন!

–আম্মাজান! আমি যা বলতে এসেছি, আপনি অভয় না দিলে বলার সাহস পাচ্ছি না।

–কোনও ভয় নেই আপনি বলুন!

বুড়ি একে একে সব কথা খুলে বললো। সব শুনে রাজকন্যা মুচকি হেসে বললেন,

–আমি বিয়েতে রাজি।

–কী বলছেন আপনি!

–জি। ঠিকই শুনেছেন। তবে একটা শর্ত আছে।

–কী শর্ত?

–আপনার ছেলেকে বলবেন, সে যেন একটানা চল্লিশদিন পর্যন্ত পাঁচওয়াক্ত ফরয নামায তো বটেই, তাহাজ্জুদও পড়ে। একদিনও যেন তাহাজ্জুদ বাদ না যায়!

.

বুড়ি খুশিমনে ফিরে এলো। ছেলেকে ভেঙে বললো। ছেলে তো মহাখুশি। এ তো সহজ। চল্লিশটা দিন দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। শুরু হলো নামাযের মাধ্যমে নারী পাওয়ার সাধনা (!)। প্রথম দিন গেলো। নামায তো নয় যেন, রাজকন্যার মনছবিই আঁকা হলো। রুকুতে-সিজদাতে সারাক্ষণ শুধু তার অনিন্দ্য ছবিই চোখে ভাসতে থাকলো।

দ্বিতীয় দিনও গেলো। তৃতীয় দিন শেষ। চতুর্থ দিন থেকে অবস্থা পাল্টাতে শুরু করলো। রাজকন্যার চেহারা ফিকে হতে শুরু করলো। ম্লান হতে হতে একসময় তাহাজ্জুদে দাঁড়ালে আর কোনও মানবীর চেহারা ভেসে ওঠে না।

.

চল্লিশ দিন পার হওয়ার পর দেখা গেল যোগালি পাক্কা নামাযী ও তাহাজ্জুদগুজার বনে গেলো। তার মনে গেঁথে যাওয়া অপ্সরীর প্রেম, আল্লাহর মহব্বতে রূপান্তরিত হলো। মনটা এখন সৃষ্টির স্থানে স্রষ্টার দিকে পরিপূর্ণ ঝুঁকে পড়লো।

.

সময় পার হওয়ার পর মা বললেন,

–এবার প্রস্তাবটা দিয়ে আসি?

–নাহ, আমার আর এ-বিয়েতে আগ্রহ নেই। আগে আমি তার ক্ষণিকের সৌন্দর্যে মজে গিয়েছিলাম। এখন তার স্রষ্টার চিরন্তন সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়ে গেছি।

.

এবার মায়ের আফসোস!

-হায়! হায়! ছেলে কতোবড় সম্পদ হেলাফেলাভরে পায়ে ঠেলে দিচ্ছে। এমন সুযোগ হাজারে-লক্ষে একবার মেলে! তা কিনা সে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সাথে উপেক্ষা করছে।

.

রাজকন্যার কাছে সংবাদ পৌঁছলো। তিনি স্বগতোক্তি করলেন:

–এমন অবস্থা হবে, আগেই জানতাম। বান্দা যখন তাহাজ্জুদ পড়ে, আল্লাহ তাকে সবকিছু থেকে বেনিয়ায-অমুখাপেক্ষী করে দেন। দুনিয়া ও মানুষের ভালোবাসা তার অন্তর থেকে দূর করে দেন।

জীবন জাগার গল্প : ৪৪৩

বুদ্ধিমান বোকা

দাদা: ধরো আল্লাহ তোমাকে বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন। তোমার দায়িত্ব কি?

নাতি: আমার দায়িত্ব হলো সে বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানো।

–কিভাবে কাজে লাগবে?

–বুদ্ধি দিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করবো। নিজের ও পরের উপকার করবো।

–দেখো ভাই, সব সময় কিন্তু বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগানো বুদ্ধির কাজ নয়। কিছু কিছু সময় এমনও আসে, যখন নিজের বুদ্ধিমত্তাকে চেপে যেতে হয়। বুদ্ধির সাহায্যে সত্য প্রকাশ পেলেও এড়িয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধির পরিচায়ক। তোমাকে সেসব ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান বোকা সাজতে হবে।

–সেটা আবার কেমন কথা?

–একটা গল্প বলছি শোন:

অন্যায় বিচারে, তিন জন নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুদণ্ডের রায় হলো। একজন আলিম। একজন উকিল। একজন পদার্থবিদ।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে 'গিলোটিন'এর সাহায্যে।

.

প্রথমেই আলিমের পালা। গিলোটিনের নিচে মাথা রাখা হলো। রায় কার্যকর করার আগে বিচারক জানতে চাইলেন,

–আপনার শেষমুহূর্তে বলার মতো কোনও কথা থাকলে বলতে পারেন।
আলিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,
–আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ! তিনিই আমাকে এ অন্যায় বিচার থেকে বাঁচাতে পারেন।
গিলোটিন ছেড়ে দেয়া হলো। মাথার কাছে এসে গিলোটিন থেমে গেলো। আর নিচে নামলো না। উপস্থিত দর্শকরা ভীষণ অবাক হয়ে গেলো। তারা আলিমের বুযুর্গি এবং আল্লাহর কুদরত দেখে অভিভূত হয়ে পড়লো।

.

এরপর এলো উকিলের পালা।
–আপনার কি বলার মতো কিছু আছে?
–আমি তো শ্রদ্ধেয় আলিমের মতো আল্লাহকে চিনতে পারিনি। কিন্তু আল্লাহর ন্যায়বিচারের কথা জানি। সুবিচার। সুবিচার। সুবিচার।
গিলোটিনের রশি ছেড়ে দেয়া হলো। এবারও সবাইকে অবাক করে দিয়ে, মাথার কাছে এসে, গিলোটিন থেমে গেলো। উকিলও বেঁচে গেল।

.

পদার্থবিদ এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গিলোটিনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিছু একটা বুঝতে পেরে, তার মুখে মুচকি হাসি লেগে ছিল। তাকে গিলোটিনের নিচে রাখা হলো,
–আপনার জীবনের শেষ কথা কিছু আছে?
–আমি আমি সারাজীবন বুদ্ধির চর্চা করেছি। জ্ঞানসাধনা করেছি। আমি আলিমের মতো আল্লাহকে চিনতে পারিনি। উকিলের মতো সুবিচারও বুঝিনি। আমি মাথা খাটাতে শিখেছি। আজও মাথা খাটিয়ে দেখলাম, গিলোটিন যে রশিতে বাঁধা আছে, তাতে একটা গিঁঠ আছে। এ গিঁঠের কারণেই নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ নামার পর গিলোটিনটা থেমে যাচ্ছে।

.

সবাই তাকিয়ে দেখলো তাই তো! জল্লাদ তাড়তাড়ি গিঁঠটা খুলে দিল। সাথে সাথে গিলোটিন সজোরে নেমে এসে পদার্থবিদের মাথা কেটে ফেললো।

.

দাদা: বুঝলে তো নাতি! কখনো সত্য জানলেও, মুখ বন্ধ রাখাই বুদ্ধিমানের। যতই তোমার নিকটতম বন্ধু হোক, তার কাছে তোমার সব কথা খুলে বলতে যেয়ো না। পরিস্থিতি বদলে গেলে, সে তোমার এ গোপন কথা দিয়ে তোমাকে ঘায়েল করতে দ্বিধা করবে না।

জীবন জাগার গল্প : ৪৪৪

গরু হাদিয়া

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা মধ্যম। কোনও রকমে একটা ছাগল কেনা যাবে। এবার ছাগল দিয়েই কুরবানি দিবে বলে ঠিক করলো গৃহকর্তা। বাজারে গিয়ে দরদাম করে একটা ছাগল কিনে ফেলল।

.

বাজারে আরও কিছু কাজ বাকি থেকে গেছে। ছাগল নিয়ে বাজারে ঘোরাটা কষ্টকর দেখে, এক পরিচিত লোককে বললো,

–ভাই, তুমি বাড়ি যাওয়ার পথেই তো আমাদের বাড়ি পড়বে, ধরো আমাদের ছাগলটা বাড়িতে রেখে যেয়ো। আমি আরেকটু পরে বাড়ি যাবো।

.

লোকটা ছাগল নিয়ে ভুলক্রমে পাশের বাড়িতে গিয়ে বললো:

–ধরো, কুরবানির ছাগলটা বেঁধে রাখো।

আর বেশি কিছু না বলে, হন হন করে চলে গেল।

বাড়ির লোকেরা অবাক! তাদের পেটে ভাত জুটছে না, কুরবানির জন্তু তো অনেক দূরের কথা! তবুও তারা ভীষণ খুশি হলো। হয়তো আল্লাহর কোন বান্দার উসিলায় ব্যবস্থা হয়েছে। ছেলেরা ছাগল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

.

বাচ্চাদের ছাগল নিয়ে হৈ-হুল্লোড় দেখে, পাশের বাড়ির গিন্নি অবস্থা জানতে এলেন। অবস্থা দেখে মনে মনে চিন্তা করলেন, তাদের তো ছাগল কেনার টাকা থাকার কথা নয়! কোথায় পেল?

.

সন্ধ্যার মুখেই কর্তা ফিরে এলেন। তিনি ভেবেছিলেন ঘরে এসে দেখবেন, বাচ্চারা ছাগল নিয়ে আনন্দে মেতে আছে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটলো না। সবই স্বাভাবিক। ছেলেরা কুপি জ্বালিয়ে পড়তে বসেছে। বউ রান্নাঘরে। অবাক হয়ে জানতে চাইলেন,

–কি রে! আমাদের ছাগলটা কোথায়? একজন এসে ছাগল দিয়ে যায়নি?

-কই, কেউ তো ছাগল দিয়ে যায়নি? তবে পাশের বাড়িতে একজন একটা ছাগল দিয়ে গেছে।

.

স্বামী খোঁজ নিয়ে বুঝতে পারলেন ভুলটা কোথায় হয়েছে। স্ত্রী বললেন:

-ঠিক আছে, এখন গিয়ে ছাগলটা নিয়ে এলেই তো হয়।

-নাহ, তা কী করে হয়। গরীব বাচ্চাগুলো ছাগলটা পেয়ে কী যে খুশি হয়েছে! আমি তাদের খুশি নষ্ট করবো? অসম্ভব।

-তাহলে আর কি, আপনার ছেলেরা এবার কুরবানি না করেই বসে বসে আঙুল চুষুক!

.

বেচারা বিচলিত হয়ে পড়লেন। পরদিন এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা করয করে সকাল সকাল বাজারে রওয়ানা দিলেন। গিয়েই দেখলেন, একজন বড় পশু ব্যবসায়ী এইমাত্র বাজারে এলেন। তাকে গিয়ে বললেন,

-আমাকে কুরবানির জন্যে খুবই ছোট দেখে একটা ছাগল দেখান।

ব্যবসায়ী হাসিমুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বড় নাদুস-নুসুদ একটা গরু এনে 'গৃহকর্তার' হাতে রশিটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন:

-এই নিন আপনার কুরবানির গরু।

-আমার তো এ গরু কেনার মত টাকা নেই।

-আপনাকে টাকা দিতে হবে না।

-তো?

-এটা আমার পক্ষ থেকে হাদিয়া। আমি বাজারে আসার পথে ভীষণ এক বিপদে পড়েছিলাম। তখন মনে মনে ঠিক করেছি, আজ বাজারে যিনি প্রথম ক্রেতা হবেন, তাকে কুরবানির জন্যে সবচেয়ে ভাল গুরুটা হাদিয়ে দেব।

জীবন জাগার গল্প : ৪৪৫

মায়ের ভালোবাসা!

বিয়ের পর অনেক বছর কোন ছেলেপিলে হয়নি। চেষ্টা-তদবিরে কোন ঘাটতি করেনি নিঃসন্তান দম্পতি। আশা ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম। আল্লাহ মুখ তুলে

চাইলেন। মাঝ বয়েসে একটা পুত্রসন্তান দান করলেন। আকাশের চাঁদ হাতে জুটলো।

•

ছেলেকে ভালো স্কুলে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হলো। বাবা-মা না খেয়ে ছেলের খরচ যোগালো। চেষ্টা বৃথা যায়নি। ছেলে একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বের হলো। চাকুরি পেতেও দেরি হলো না। মাইনেপত্রও ভাল। থাকার বাসাও জুটেছে একখান। বাবা-মাকে গ্রাম থেকে নিয়ে এলো। কিন্তু বুড়ো-বুড়ির শহরে ভালো লাগে না। হাঁপ ধরে যায়। গ্রামেই ভালো লাগে। বাবা একদিন ছেলেকে বললেন,

–বাবা! তুই তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা নে। তোর জন্যে তো শহুরে মেয়েই ভালো হবে। আমরা তো এখানে কাউকে চিনি না। তোর চিন-পরিচয় থেকে পছন্দসই পাত্রীর খোঁজ পাওয়া যায় কি না দেখ!

•

কিছুদিন পর বিয়ে হলো। মা-বাবা গ্রামের বাড়িতে চলে এলেন। সপ্তাহান্তে ছেলে-বউ মিলে একবার দেখা করে যেত। সন্তান হবার পর আসা-যাওয়াটা কমে গেলো। আর বড়লোক বধূরও গ্রামে আসতে ভালো লাগতো না। স্বামীর ঘনঘন গ্রামে আসাও পছন্দ করতো না। গ্রামের সাথে সম্পর্ক অনেকটা ছিন্ন হয়ে গেলো। সৌদি আরবে একটা কোম্পানীতে চাকুরির আবেদন করার সাথে সাথে গৃহীত হয়ে গেলো। শুরু হলো বিদেশের জীবন। আগে তো ছ'মাসে-ন'মাসে একবার হলেও গ্রামে যাওয়া হতো। এবার তাও বন্ধ হয়ে গেলো।

•

মক্কায় আসার কথা শুনে মা-বাবার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তারা সানন্দেই অনুমতি দিয়েছিলেন:

–বাবা তুমি নবীর দেশে যাবে। সেখানে সার্বক্ষণিক থাকবে, সে তো আনন্দের কথা। আমাদের তো যাওয়ার ক্ষমতা নেই। তুমি গেলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবো। নিজে না গেলেও ছেলে-বৌমা কাবার দেশে আছে।

•

মক্কায় থাকার সুবাদে প্রতি বছরই হজ্জ করার সৌভাগ্য হয়। এবারও হলো। হজ্জের পর একদিন মাতাফে বসে আছে। চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ। পাশে বসা ছিলেন এক বৃদ্ধ লোক। জানতে চাইলেন,

–তোমাকে অনেকক্ষণ যাবত লক্ষ করছি, মুখ গোমড়া করে বসে আছো। কোনও সমস্যায় পড়েছো? সামনেই বায়তুল্লাহ! এখানে তো কেউ সমস্যা নিয়ে বসে থাকে না!

–জি, ঠিক ধরেছেন। একটা ভিন্নধর্মী সমস্যায় পড়েছি। আপনি অপরিচিত। কিভাবে বলি!

–একান্ত গোপনীয় কিছু না হলে পারো। আল্লাহ হয়তো একটা পথ খুলে দিবেন।

–গতরাতে ঘুমিয়ে আছি। আধো ঘুম, আধো জাগরণের মাঝে আছি। কে যেন আমার কানের কাছে এসে বললো,

–তোমার হজ তো কবুল হয়নি!

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। তখন থেকেই মনে তোলপাড় চলছে।

–শোন ব্যাটা! তুমি কি এমন কোনও গুনাহ করছো, যার কুফলটা সারাক্ষণ তোমার পিছু তাড়া করে ফিরছে?

–জ্ঞানতঃ কোনও পাপ তো করি না!

–বাড়িতে মা-বাবা আছেন?

এবার তার টনক নড়লো। দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। কান্নাভেজা কণ্ঠে বললো,

–জি। বাড়িতে মা-বাবা আছেন। এবং আমি আমার গুনাহটা কী, সেটাও বুঝতে পারছি!

•

প্রায় বারো বছর কেটে গেছে। মা-বাবার সাথে দেখা নেই। যোগাযোগ নেই। ছেলে হজ্জের বাকী কাজ সেরে আর দেরী করলো না। কোম্পনী থেকে ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে এলো। গ্রামের মুখেই অনেক পরিচিত মুখের সাথে দেখা। একজনের কাছে বাবা-মায়ের কথা জানতে চাইলো,

–ও! তোমার বাবা তো গত মাসে মারা গেছেন। মা হয়তো বেঁচে আছেন।

ছেলের মনে তোলপাড় শুরু হলো। হায় হায়! কী করেছি আমি! কতোটা নিমকহারামি করেছি! একপ্রকার দৌড়েই হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি এলো। ঘরটার বড়োই জীর্ণ-দীর্ণ অবস্থা। পড়ো পড়ো। কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে। দুয়ারে গিয়ে পা আর উঠতে চাইছে না। না জানি কী খবর অপেক্ষা করছে। দুরুদুরু বক্ষে দরজা ঠেলে প্রবেশ করলো। মা কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন।

মুমূর্ষ অবস্থা। পাশের বাড়ির এক মহিলা শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। ছেলে মুখের কাছে কান নিয়ে শুনলো। তিনি বলছেন,
–ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার নাড়ির ধনকে ফিরিয়ে দিন। তাকে সুস্থ রাখুন। মরার আগে তাকে একবার হলেও দেখতে চাই!

ছেলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বললো,
–মা গো! এই যে আমি এসেছি।
মা হাত তুলে ছেলের কপালে ছোঁয়ালেন। পাশের মহিলা বললেন,
–উনি চোখে দেখতে পান না। আপনি চৌকির ওপর তার কোলঘেঁষে বসুন।
মা ক্ষীণস্বরে বললেন,
–আয় কাছে আয়। তোর গায়ের ঘ্রাণটা শুঁকি। চোখে তো দেখবো না, একটু ছুঁয়ে হলেও তোকে অনুভব করি!

চারদিন পর মা মারা গেলেন।

জীবন জাগার গল্প : ৪৪৬

বিশ্বব্যাপী আযানধ্বনি

অনেক আগে। মাসিক জাগো মুজাহিদ না কোন পত্রিকায় যেন, ঠিক মনে পড়ছে না। একটা খবর পড়ে দারুণভাবে আলোড়িত হয়েছিলাম। খবরটা হলো, বিশ্বে প্রতিটি মুহূর্তেই আজনের ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। কয়দিন আগে একটা লেখায় সেই হিশেবটা পেলাম।

***

পৃথিবীর মানচিত্রে সবচেয়ে পূর্ব প্রান্তের মুসলিম দেশ হলো ইন্দোনেশিয়া। এ দেশের প্রধান শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে:
= সাবিল, জাভা, সুমাত্রা, বর্নিয়া ।
ফজরের সময়, এই সাবিল শহর থেকে শুরু হয় হাজার হাজার ইন্দোনেশীয় মুয়াজ্জিনের আযান। ফজরের আজানের এই প্রক্রিয়া ক্রমেই এগিয়ে চলে পশ্চিমের দিকে।

***

সাবিলের আজান শেষ হওয়ার প্রায় দেড় ঘণ্টা পর জাকার্তায় প্রতিধ্বনিত হয় আজানের সুর। এরপরই সুমাত্রায় শুরু হয় আজানের এই পবিত্র প্রক্রিয়া। ইন্দোনেশিয়ার আযানের ধ্বনি শেষ হওয়ার আগেই শুরু হয়ে যায় পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশ মালয়শিয়ায় । মালয়েশিয়া থেকে বার্মা । জাকার্তায় শুরু হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আজানের সুর পৌছে যায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। বাংলাদেশের পর আজানের জয়যাত্রা চলে পশ্চিম ভারতের দিকে। কলকাতা থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত এবং তারপর এগিয়ে যায় বোম্বের দিকে ।

***

শ্রীনগর এবং শিয়ালকোট (পাকিস্তানের উত্তরের একটি শহর) শহর দু'টিতে আজানের সময় একই সাথে শুরু হয়। শিয়ালকোট, কোয়েটা এবং করাচীর মধ্যে সময়ের পার্থক্য চল্লিশ মিনিটের মত । তাই এ সময়ের মধ্যে সমগ্র পাকিস্তান জুড়ে শোনা যায় আজানের সুর। সেই সুর পাকিস্তানে মিলিয়ে যাবার আগেই আফগানিস্তান আর মাস্কাটে এসে এর ঢেউ লাগে। বাগদাদের সাথে মাস্কাটের সময়ের পার্থক্য এক ঘণ্টার।

***

আজানের আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয় 'হিজায-ই-মুকাদ্দাস' (মক্কা-মদীনার পবিত্র শহরসমূহ), ইয়েমেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত এবং ইরাকের আকাশে বাতাসে। বাগদাদ এবং মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার সময়ের পার্থক্যও এক ঘণ্টা । তাই এ সময়ের মধ্যে সিরিয়া, মিশর, সোমালিয়া এবং সুদানে চলতে থাকে আজান।

***

পূর্ব ও পশ্চিম তুরস্কের মধ্যে ব্যবধান দেড় ঘণ্টার, এ সময়ের মাঝে সেখানে নামাযের আহ্বান শোনা যায়। আলেকজান্দ্রিয়া এবং ত্রিপলি (লিবিয়ার রাজধানী) এক ঘণ্টার ব্যবধানে অবস্থিত। একইভাবে আজানের প্রক্রিয়া সমগ্র আফ্রিকা জুড়ে চলতে থাকে। এরপর আটলান্টিক মহাসাগরের দেশ মরক্কো, মৌরিতানিয়ায় এসে পৌছে।

***

পৃথিবীর পূর্ব উপকূলে তাওহীদ এবং রিসালাতের প্রচারের যে ধারা শুরু হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ায় তা এসে আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে পৌঁছে সাড়ে নয় ঘন্টা পর।

***

ফজরের আজানের বার্তা আটলান্টিকের উপকূলে পৌছাবার পূর্বে ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলে যোহরের আজানের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং ঢাকায় এটা পৌঁছানোর পূর্বেই সেখানে শুরু হয়ে যায় আছরের আজান। দেড় ঘন্টার মত সময় পেরিয়ে এ প্রক্রিয়া যখন জাকার্তায় পৌঁছে ততক্ষণে সেখানে মাগরিবের সময় হয়ে আসে, এবং মাগরিবের সময় সুমাত্রায় শেষ না হতেই সাবিলে এশার আজানের আহ্বান ভেসে আসে।

***

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই আমাদের চোখে পড়বে আজানের অবাক করা দিকটি। তা হলো,

= পৃথিবীর বুকে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও হাজার হাজার মুয়াজ্জিনের গলায় উচ্চ স্বরে আজানের সুর ভেসে বেড়ায়। এমনকি আমরা যে মুহূর্তে আমার এই লেখাটা পড়ছি, নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ঠিক এই মুহূর্তেও এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও অন্ততঃ হাজার খানেক মানুষ শুনতে পাচ্ছে আজানের সুর, মুয়াজ্জিনদের গলায়, আর এমনি করে সে আহ্বান ভেসে বেড়াচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে।

আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!
হাইয়া আলাস সালাহ!
হাই আলাল ফালাহ!
এসো কল্যাণের পথে!

জীবন জাগার গল্প : ৪৪৭

কুরআন তিলাওয়াত

ইমাম আহমাদ (রহ.): শুনলাম তুমি নাকি প্রতি রাতে এক খতম কুরআন কারীম তিলাওয়াত করো?

ছাত্র: জি, ইয়া শায়খ!

ইমাম সাহেব: তাহলে এক কাজ করতে পারবে?

-কী কাজ?

-আজ রাতে যখন তিলাওয়াত করবে, মনে মনে ভাববে তুমি আমার সামনে বসে তিলাওয়াত করছো। কাল এসে হালত জানাবে।

.

পরদিন

-কী অবস্থা বলো তো?

-শায়খ! গত রাতে দশ পারার বেশি তিলাওয়াত করতে পারিনি।

-আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি আজ রাতে তিলাওয়াতের সময় তুমি ভাববে, তোমার সামনে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন। আগামীকাল এসে হালত জানাবে।

.

পরদিন

-কতটুকু তিলাওয়াত করলে?

-আশ্চর্য, আমি ত্রিশতম পারাটাও শেষ করতে পারিনি।

-আগামীকাল আরেকটা কাজ করবে। তুমি তিলাওয়াতের সময় ভাববে তুমি রাব্বুল আলামীনের সামনে বসে তিলাওয়াত করছো। তিনি তোমার তিলাওয়াত শুনছেন।

পরদিন

-কী হলো? কারগুজারি বলো!

ছাত্র কান্নায় ভেঙে পড়ে বললো

-ইয়া শায়খ! আমি সারা রাতে সূরা ফাতিহাও শেষ করতে পারিনি!

সমাপ্ত। আলহামদু লিল্লাহ।